ছেংথুংফা নাইথকবী

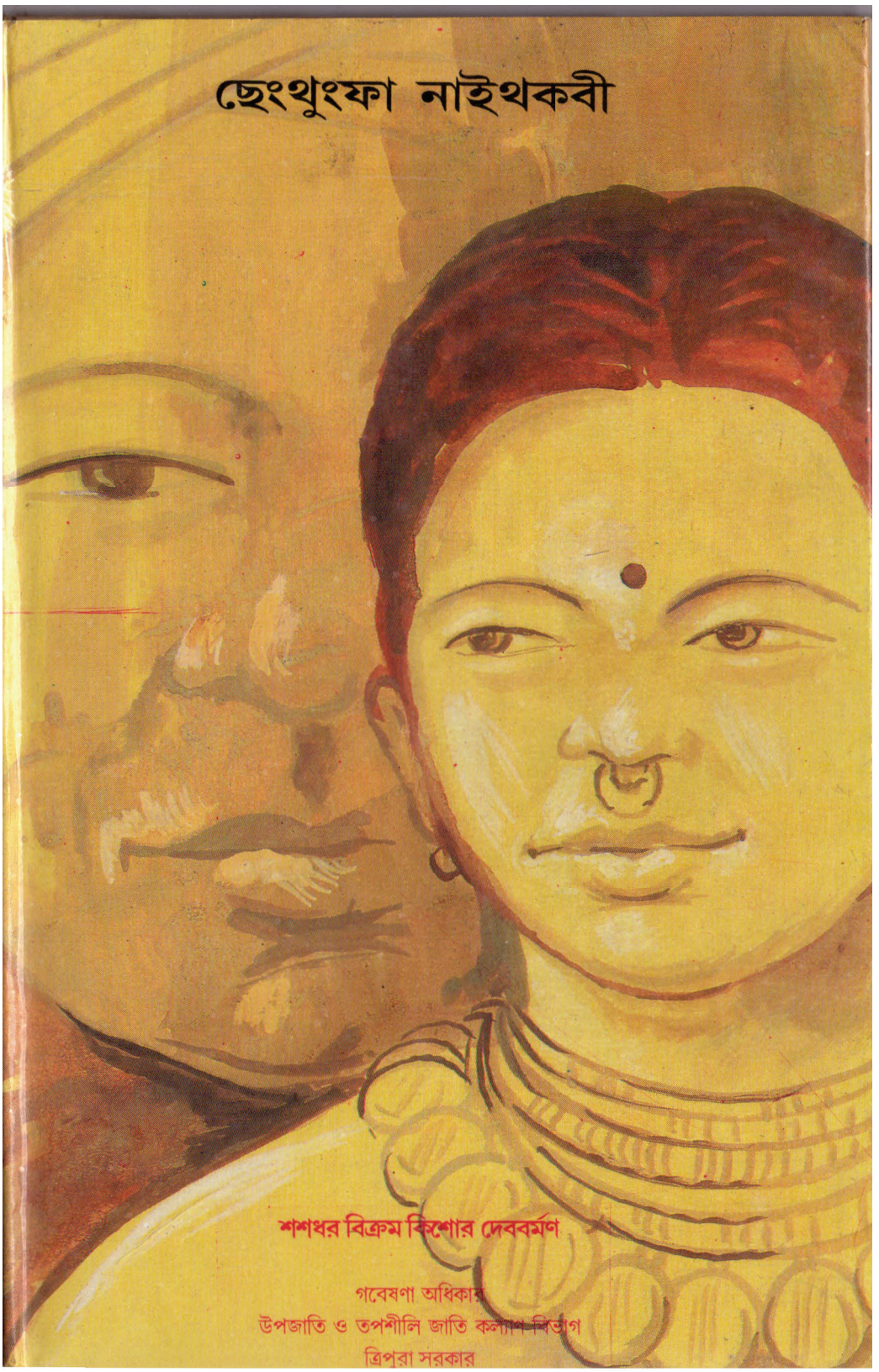

শশধর বিক্রম কিশোর দেববর্মণ

গবেষণা অধিকার
উপজাতি ও তপশীলি জাতি কল্যাণ বিভাগ
ত্রিপুরা সরকার

ছেংথুংফা নাইথকবী

শশধর বিক্রম কিশোর দেববর্মণ

গবেষণা অধিকার
উপজাতি ও তপশীলি জাতি কল্যাণ বিভাগ
ত্রিপুরা সরকার ।

প্রকাশক
গবেষণা অধিকার
উপজাতি ও তপশীলি জাতি কল্যাণ বিভাগ
ত্রিপুরা সরকার

মুদ্রণে
ক্যুইক প্রিন্ট
১১, জগন্নাথ বাড়ী রোড আগরতলা ।

মূল্য ঃ ২৩ টাকা

দু'টি কথা

''ছেংথুংফা-নাইথকবী'' রূপকতাটি পুস্তকাকারে বের করা হল। এই সংগে শেষ হল আমাদের বর্তমান পর্যায়ের প্রকাশনা। ইতিপূর্বে আমরা ''ইরিজুক'' ''তাখুগনুই'' ও ''নকাপলিনি হামজাকমা'' নামকআরও তিনটি রূপকথা বের করেছি। প্রকাশিত রূপকথাগুলো সুধী পাঠকবৃন্দের সমাদর লাভ করেছে জেনে আমরা সুখী হয়েছি। আদিবাসী জীবনের কৃষ্টি, ধ্যান-ধারণায় পরিচায়ক রূপকথাগুলোর মধ্যে বর্তমান পূর্যায়ে প্রকাশিত ''ছেংথুংফা - নাইথকবী'' অন্যতম। আশা করি বর্তমানে প্রকাশিত রূপকথাটিও অন্যান্য প্রকাশিত রূপকথাগুলোর ন্যায় সমাদর লাভ করবে।

পরবর্তীকালে আমরা আরও কিছু রূপকথা প্রকাশের ইচ্ছা রাখি। উৎসাহী পাঠক ও সুধীজনের সাহচর্য সমাদরের সহিত গৃহীত হবে। ইতি --

এস, বি, কে, দেববর্মণ।

ট্রাইবেল রিসার্চ অধিকর্তা

আগরতলা ত্রিপুরা।

ছেংথুংফা - নাইথকবী

বনের তরিতরকারী তুলতে তুলতে হঠাৎ নাইথকবী ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে একটা বন্য শূকরকে ওদেরই দিকে ছুটে আসতে দেখল। হতচকিয়ে উঠেই নাইথকবী হাতে তীরধনুক নিয়ে এক নিমেষে অব্যর্থ লক্ষ্যে শূকরটাকে মাটিতে ফেলে দিল। নাইথকবীর বান্ধবীরা অবাক হয়ে ওর অব্যথ্য নিশানার কথা বলাবলি করছিল। ইত্যবসরে যুবরাজও ঘোড়া ছুটিয়ে মরা শূকরটার কাছে এসে পৌঁছে গেছেন। যুবরাজের সঙ্গে আছে বড় ও ছোট হাজারী আর দশ বারজন বিনদিয়া বা সৈনিক। মরা শূকরটার কাছে এসে যুবরাজ অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন ওটার দিকে। আর ভাবতে লাগলেন, আমিতো একটা তীরই মেরেছি; তাতে শূকরটা জব্দ হয়নি। কিন্তু এখন দেখছি শূকরটা গায়ে দুটো তীর এবং নিশ্চিতভাবে বলতে গেলে শেষের তীরটাতেই শূকরটা জব্দ হয়েছে। আশ্চর্য, শেষের তীরটা কোত্থেকে এল! কার এমন অব্যর্থ লক্ষ্য যে ছুটন্ত শূকরটার ঠিক কানের কাছে একটা তীর মেরেই শূকরটাকে ঘায়েল করে! বীরের পূজারী যুবরাজ। তাই তীর নিক্ষেপকারীর প্রতি তাঁর মনটা শ্রদ্ধায় ভরে গেল। রাজপুত্র মুখ তুলে চারদিকে তাকাতে লাগলেন। এবার যুবরাজের আরও অবাক হবার পালা। খানিকটা দূরেই কয়েকটি যুবতী মেয়ে ওর দিকেই তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নিশ্চই ওদের মধ্যেই কারো এমন অব্যর্থ নিশানা, ওদের মধ্যেই কেউ হয়ত শূকরটাকে মেরেছে। ওদের মধ্যেই কেউ শূকরটাকে মেরেছে কিনা জেনে আসতে রাজপুত্র বড় হাজারীকে পাঠিয়ে একটু দূরে গিয়ে একটা গাছের নীচে দাঁড়ালেন।

এদিকে ঘোড়ার উপর বসে থাকা যুবরাজের দিকে নাইথকবীও এক দৃষ্টে চেয়ে আছে। সাথে সাথে ওদের গতিবিধিও লক্ষ্য করছিল। ওদেরই দিকে একজন লোককে ছুটে আসতে দেখে মেয়েদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। ওরা নিজেদের মধ্যে নানা কথা বলাবলি করতে লাগল। পুনাংতি বলল, দেখ দিদি,আমাদের দিকেই একজন লোক ছুটে আসছে। নাইথকবী বলল, তা আসুক না, তোরা চুপ করে থাক। মলকতি বলল - ওদের দেখে আমার কিন্তু ভয় ভয় করছে। ওর কথা শেষ হতে না হতেই ভয় মিশ্রিত সুরে করমতি বলে উঠল — আমারও ভাই কেমন কেমন মনে হচ্ছে। ওদের কথা শুনে নাইথকবী খুব রেগে গিয়ে বলতে লাগল, এত ভয়ই যদি করবি তবে আমার সাথে এলি কেন? আমার সাথে এলে ভয় পেলে চলবে না। আমার হাতে তীর ধনুক থাকতে আমি কাউকে ভয় করি না — তা মানুষই হোক কিংবা বনের জীব জানোয়ারই হোক। প্রয়োজন হলে আমি ওদের দলের সাথে যুদ্ধ করতেও পিছপা হব না; যোদ্ধার মেয়ে আমি, মরতে ভয় পাই না। লোকটাকে আসতেই দেনা, ও এসে কি বলে একবার দেখাই যাক না। তোরা অস্থির হবি না। আমিই ওর সাথে কথা বলব। তোরা নির্ভয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাক। এদিকে দলের একজন নাইথকবীকে বলল, দেখ দেখ, ঘোড়ায় চড়া লোকটা কেমন একদৃষ্টিতে তোর দিকে তাকিয়ে আছে। নাইথকবী বলল, তার শিকারটা আমরা মেরেছি বলে হয়ত লোকটা অস্বস্তি বোধ করছে। ওদের মধ্যে যখন এসব কথা বলাবলি হচ্ছে এমন সময় বড় হাজারী ঘোড়া হাকিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হল। বড় হাজারী সবাইকে উদ্দেশ্য করেই বলল, দেখ ওই যে গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি আমাদের যুবরাজ। তিনি শূকরটাকে একটা তীর মেরেছিলেন, লেগেছিলও । তবে শূকরটা থাকেনি। শূকরটার কানের পাশেই আর একটা তীর দেখতে পাচ্ছি। এবং সে তীরটাতেই শূকরটা ঘায়েল হয়েছে। ওই দ্বিতীয় তীরটা কে মেরেছে যুবরাজ জানতে চেয়েছেন। দ্বিতীয় তীরটা কে মেরেছে হয়ত তোমরা দেখে থাকবে; কিংবা তোমাদের মধ্যেই কেউ মেরেছে । হাজারীর কথা শুনে নাইথকবী বলল, আমিই মেরেছি। কেন, তিনি কি আমার উপর রাগ করেছেন? হাজারী বলল, না — না, রাগ করবেন কেন । তিনি শূকরটাকে মারবার জন্য ঘুরছিলেন। কিন্তু পারেননি। তোমাদের তীরেই ওটা মরেছে। তিনি বরং অবাক বিস্ময়ে তোমাকে প্রশংসাই করেছেন। তাই তিনি তোমার পরিচয় জানতে আমাকে পাঠিয়েছেন। এবার তুমি তোমার নাম বাবার নাম ও গাঁয়ের নাম বল দেখি মা।

হাজারীর কথা শুনে নাইথকবী বলল, আমার নাম নাইথকবী; বাবার নাম ছাদ্রাই সেনাপতি। তিনি মহারাজ ছেংকাচাক্‌ফার সেনাপতি ছিলেন। বুড়ো হয়েছেন বলে মহারাজ তাঁকে অনেক জায়গা জমি দিয়ে অবসর দিয়েছেন। বাবার নামেই এ পাড়ার নাম ছাদ্রাই সেনাপতির পাড়া। নাইথকবীর কথা শুনে হাজারী খুশী হয়ে বলল, হ্যাঁ - হ্যাঁ, তুমি বুড়ো

সেনাপতির মেয়ে? তা তোমার বাবা ভাল আছেন তো? অনেক দিন দেখিনি তোমার বাবাকে। নাইথকবীর পরিচয় পেয়ে হাজারী খুব খুশী হয়ে যুবরাজের কাছে ফিরে গিয়ে সব কিছু জানাল। শুনেই যুবরাজ বলতে লাগলেন দূর থেকে দেখলেই মেয়েটি সবার মধ্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তা হবে না কেন যেমনি বাবা তেমনি তার মেয়ে। যেমনি তার রূপ তেমনি তার গুণ। সেনাপতির ঘরে যোগ্য মেয়েই হয়েছে। আমি সারাদিন ঘুরেও শূকরটাকে ঠিকমত একটা তীর মারতে পারিনি। আর ও কিনা দূর থেকে দেখেই এক তীরেই মেরে ফেলল। ও আমার চেয়েও বড় শিকারী। এ রাজ্যে এমন মেয়ে দ্বিতীয়টি আছে বলেতো আমি জানি না - দেখিনিও । বড় হাজারী হাসতে হাসতে বলল, তা হবে না কেন যুবরাজ, যেমনি তার বাবা তেমনি তার মেয়ে। মেয়েকে শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করেছে সেনাপতি। পাহাড় অঞ্চলে এমন রূপবতী ও বীরাঙ্গনা মেয়ে দ্বিতীয়টি নেই বলেই আমার বিশ্বাস। এ মেয়ে রাজরাণী হবার উপযুক্ত।

ওদিকে যুবরাজ যখন বড় হাজারী ও অন্যান্যদের সংগে এসব কথা বলাবলি করছিলেন তখন নাইথকবীও তার বান্ধবীদের মাঝে দাঁড়িয়ে বলছিল, তোরা সবাই আমার সংগে আয়। যুবরাজকে শূকরটি উপহার দিয়ে প্রণাম করব। আমি শূকরটি মেরেছি বলে তিনি হয়ত রাগ করেছেন। চল শূকরটি উপহার দিয়ে তাঁকে খুশী করিগে। তোরা কিন্তু কেউ ভয় করিসনে। আমি যতক্ষণ আছি ততক্ষণ তোদের ভয়ের কারণ নেই। এই বলে সবাই শূকরটি ধরাধরি করে যুবরাজের কাছে নিয়ে গিয়ে একে একে সবাই যুবরাজকে প্রণাম করল।

মেয়েদের ব্যবহারে যুবরাজ ক্রমেই অবাক হচ্ছিলেন। নাইথকবীকে লক্ষ্য করে যুবরাজ বললেন — তুমিই বুঝি শূকরটি মেরেছ? নাইথকবী নত মস্তকে দাঁড়িয়ে যুবরাজকে যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়ে বিনয়ের সহিত বলল, হ্যা যুবরাজ মহারাজ, আমিই মেরেছি। যুবরাজ মৃদু হেসে বললেন তা আমাকে দিতে নিয়ে এলে কেন? তুমি মেরেছ তুমিই রাখলে পারতে। নাইথকবীও কথায় কম যায় না। সেও যুবরাজের কথায় প্রত্যুত্তর করল অতি সুন্দরভাবে । সে বলল, যুবরাজ মহারাজকে উপহার দিতে এনেছি। আপনি শূকরটি মারতে চেয়েছিলেন একথা আমি জানতাম না। হঠাৎ আমার সামনা দিয়ে শূকরটা পালিয়ে যাচ্ছে দেখে মেরে ফেলেছি। না জেনে অন্যায় করে ফেলেছি যুবরাজ মহারাজ। এখন, ধর্মাবতার যদি দয়া করে শিকারটি গ্রহণ না করেন তা হলে আমি খুবই দুঃখ পাব। নাইথকবীর সাথে যুবরাজ যতই কথা বলছেন ততই চমৎকৃত হচ্ছেন। যুবরাজ নাইথকবীর অনুরোধে শূকরটি রাখতে রাজি হলেন। এদিকে বেলাও বেশ হয়ে যাচ্ছে দেখে নাইথকবী ও তার বান্ধবীরা যুবরাজকে একে একে প্রণাম করে বনের পথে তরকারী তুলতে চলে গেল।

ওরা চলে গেলে যুবরাজ বড় হাজারীর কাছে নাইথকবীর বাবা ছাদ্রাই সেনাপতির

বাড়ীর ঠিকানা জেনে নিয়ে সংগের লোকজনদের সেদিকেই যেতে আদেশ করলেন। কয়েকজন বিনন্দিয়া শূকরটি বয়ে চলল। যেহেতু শূকরটি নাইথকবীর তীরেই মরেছে, তাই যুবরাজের ইচ্ছা - শূকরটি নাইথকবীদের বাড়ীতেই কেটেকুটে সবাই মিলে খাওয়া যাক্। তাই যুবারাজও সংগের লোকজনদের নিয়ে সেদিকেই চললেন। কয়েকটা জুমের বাঁক পেরিয়ে বড়হাজারী ও ছোটহাজারী যুবরাজকে নিয়ে ছাদ্রাই সেনাপতির বাড়ীতে গিয়ে উঠল। ছাদ্রাই সেনাপতি খুবই আনন্দিত হয়ে যুবরাজকে প্রণাম করল। তার স্ত্রীও স্বামীর ডাকে তড়িঘড়ি করে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে যুবরাজকে প্রণাম করল। আজ বৃদ্ধ সেনাপতি ও তার স্ত্রীর খুব আনন্দের দিন। স্বয়ং যুবরাজ তাদের বাড়ীতে এসেছেন অতিথি হিসাবে। এ যেন হাতে চাঁদ পাওয়ার মত।

যুবরাজের পিতা বৃদ্ধ মহারাজের দয়াতেই ছাদ্রাই সেনাপতির আজ এত বিষয় আসয়। মহারাজের নুন-নিমক খেয়েই বৃদ্ধ সেনাপতি মানুষ হয়েছে। যুবরাজকে দেখে প্রথমেই সেনাপতি বৃদ্ধ মহারাজার ও মহারাণীর কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করল। একেএকে পুরাণো সংগী সাথীদের শুভাশুভ খবরাখবর নিতেও ভুলল না। আজ বুড়ো সেনাপতির পুরানো দিনের কত স্মৃতিই মনে পড়ছে। মনে পড়ছে বৃদ্ধ মহারাজার ছোট বড় কত স্নেহের কথা। যৌবনে সেনাপতির পদ পেয়ে কত যুদ্ধইনা করেছে। কোনদিন পরাজয়ের গ্লানি বয়ে রাজ দরবারে ফিরে আসেনি। যুবরাজের কাছে গৌরবময় স্মৃতির কথা ও বৃদ্ধ মহারাজার স্নেহের কথা বলতে বলতে ছাদ্রাই সেনাপতির চোখে জল প্রায় এসে গেল। একথা সেকথা বলার পর একসময়ে বিনন্দিয়াদের বয়ে আনা যুবরাজের শিকাটার কথাও উঠল । একথা উঠতেই যুবরাজ ছাদ্রাই সেনাপতির মেয়ের গুণপণার কথা বলতে লাগলেন। যুবরাজ বল্লেন, তিনি বেশ কিছুক্ষণ ধরে শূকরটার পিছনে পিছনে ছুটছিলেন। কিন্তু কিছুতেই শূকরটাকে কাবু করে উঠতে পারছিলেন না। নাইথকবীরা এসময় একটা জুমের কাছে তরিতরকারী তুলছিল। আশ্চর্য্য ওর হাতে নিশানা। একটা তীরেই ধাবন্ত শূকরটাকে কাত করে ফেলেছে। আর কী চমৎকার ওর ব্যবহার। যেইমাত্র জেনেছে আমি শূকরটার পিছনে ধাওয়া করেছি, ওটা আমারই শিকার —সাথে সাথে ও বান্ধবীদের নিয়ে শূকরটি আমার কাছে বয়ে এনে আমাকে দিয়ে প্রণাম করেছে। সত্যি তীর ধনুকে ওর অব্যর্থ নিশানা দেখে আমি অবাক হয়েছি। মেয়ে মানুষ তো দূরের কথা পাহাড় অঞ্চলের অনেক পাকা তীরন্দাজও ওর কাছে হেরে যাবে। তোমার সুশিক্ষায় বাহাদুরি আছে সেনাপতি। আমার রাজ্যে এমন দ্বিতীয়টি আর দেখিনি। যুবরাজের মুখে মেয়ের প্রশংসা শুনে সেনাপতি খুবই খুশী হল। তুমি আমাদের পুরাণো লোক। বাবার আমলের বিশ্বস্ত সেনাপতি। এত কাছে এসে তোমাকে না দেখে যাওয়া ঠিক হবে না তাই ভাবলাম, শিকারটা নিয়ে তোমার এখানেই উঠি। সবাইকে নিয়ে আমোদ আহ্লাদও করা যাবে, আবার কিছুক্ষণ বেশ কথাবার্তাও বলা যাবে; যুবরাজ ছাদ্রাই সেনাপতির সাথে দেশ রাজ্যের নানা কথাবার্তা

বলতে লাগলেন। ওদিকে বড় হাজারী লোকজনদের নিয়ে শূকরটাকে কেটেকুটে রান্নার ব্যবস্থা করতে লেগে গেল।

এদিকে যুবরাজ এসেছেন শুনে তিন গাঁয়ের সবাই ছাদ্রাই সেনাপতির বাড়ীতে এসে জমা হতে লাগল। ছাদ্রাই সেনাপতি একে একে সবাইকে যুবারাজের সংগে পরিচয় করিয়ে দিল। গাঁয়ের সবাই যুবরাজকে ভক্তিভরে প্রণাম করে বুড়ো মহারাজের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করল। যুবরাজ ওদের জানালেন, বাবা মহারাজ ভালই আছেন। মাতা মহারাণীর মৃত্যুর পর বাবা মহারাজার শরীর মোটেই ভাল যাচ্ছে না। রাজকার্যও আগের মত দেখাশুনা করতে পারেন না। লোকের সাথেও বড় বেশী একটি কথা বলেন না। এসব শুনে ছাদ্রাই সেনাপতির পুরাণো স্মৃতি জেগে উঠল। সে আপন মনেই বলতে লাগল, বুড়ো মহারাজার দয়াতেই আজ আমার এতটুকু হয়েছে। কত দিনের কত ছোটবড় কথাই আজ আমার মনে পড়ছে। মহারাজার সাথে কত যুদ্ধেই গিয়েছি। কিন্তু কোথাও কোনদিন হারিনি। সবচেয়ে বেশী করে মনে পড়ছে মহারাজার স্নেহের কথা। কত স্নেহই না তিনি আমাকে করতেন। এসব কথা বলতে বলতে ছাদ্রাই সেনাপতির দু'চোখ ঝাপসা হয়ে এল।

এ সময় নাইথকবীরাও বন থেকে তরিতরকারী বোঝাই 'লাঙ্গা' মাথায় নিয়ে ফিরে এল। যুবরাজ ছাদ্রাই সেনাপতি ও পাড়ার সর্দ্দারদের নিয়ে ক্লান্তি দূর করার জন্য 'বুতুক' (এক প্রকার মিষ্টি মদ) নিয়ে বসেছেন। নাইথকবীরা বাড়ীতে এসেই শুনল, যুবরাজ সংগী সাথীদের নিয়ে ওদের বাড়ীতেই উঠেছেন। একথা শুনে নাইথকবীর মনে একটা অজানা আনন্দ দোলা দিয়ে গেল। নাইথকবীরা এসেছে শুনে ছাদ্রাই সেনাপতি ঘরের বাইরে এলে সবাইকে ডেকে নিয়ে গেল যুবরাজের সংগে পরিচয় করিয়ে দিতে — যুবরাজকে প্রণাম করতে । যুবরাজতো ওদের আগেই একবার দেখেছেন, যতটুকু সম্ভব আলাপ পরিচয়ও হয়েছে। তবুও যেন নাইথকবীর সাথে ওর কথা বলতেই ইচ্ছা করে। নাইথকবী এত সুন্দর, এত কাজের মেয়ে। নাইথকবী তার বান্ধবীদের নিয়ে ঘরে ঢুকে একে একে যুবরাজকে প্রণাম করল। যুবরাজ নাইথকবীকে বন থেকে কি কি তরকারী এনেছে জিজ্ঞাসা করলেন। নাইথকবী বিভিন্ন ধরণের বনজ তরকারীর নাম বলল। কাঁচা 'থাকচাং' (এক প্রকার বনের আলু) খেতে যুবরাজের খুব ভাল লাগে বলাতে নাইথকবী দৌড়ে গিয়ে বেশ খানিকটা 'থাকচাং' কেটে ছেঁচে ছুলে থালায় করে নিয়ে এল। বেশ খানিকটা 'থাকচাং' খেয়ে নিলেন যুবরাজ। কথা প্রসঙ্গে ছাদ্রাই সেনাপতি বলল, মেয়েকে সে নিজের হাতে তীর ধনুক ও অন্যান্য অস্ত্র চালনা শিখিয়েছে। অস্ত্র চালনায় কিংবা তীর ধনুক চালনায় সে তার বাবার চাইতেও আজকাল অনেক বেশী দক্ষতা অর্জ্জন করেছে। এমনকি পাড়ার 'ছিক্রা' (অবিবাহিত যুবতী মেয়ে) মেয়েদেরও সে তীর ধনুক ও অস্ত্র চালনা শিখিয়ে ছোটখাট একটি মেয়ে সৈনিকেরদল গড়ে

তুলেছে। একথা শুনে যুবরাজ আরও খুশী হল।

যুবরাজ সেনাপতি ও অন্যান্যদের সাথে 'বুতুক' পান করতে লাগলেন। নাইথকবী যুবরাজের কাছে অনুমতি নিয়ে তার মাকে রান্না বান্নার কাজে সাহায্য করতে চলে গেছে। মুখরোচক খাবার তৈরী করতেও তীর ধনুক চালনার মতই নাইথকবীর সমান পারদর্শিতা। বিভিন্ন রকম খাবার তৈরী করল সে যুবরাজের জন্য। দুপুরের শেষে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ঝেড়ে মুছে যুবরাজকে খেতে দিল। বিভিন্ন রকম তরকারী দিয়ে যুবরাজ যতই খাবার মুখে দিচ্ছেন ততই চমৎকৃত হচ্ছেন। সত্যি পাহাড় অঞ্চলেও এত ভাল রাধুনি থাকতে পারে। রাজ বাড়ীর ভাল ভাল রাধুনীরাও ওর কাছে হেরে যাবে। যুবরাজ মনে মনে ভাবে - এ মেয়ে রাজরাণী হবারই উপযুক্ত । দুপুরের খাওয় দাওয়ার পর 'রিত্রাক' পাতা বিছানায় যুবরাজ গড়াগড়ি দিচ্ছেন। এমন সময় নাইথকবী বাঁশের হুকো দিয়ে তামাক সাজিয়ে যুবরাজের জন্য নিয়ে এল। যুবরাজ এসময়টির জন্যই প্রতিক্ষা করছিলেন। তামাক নিয়ে এলে যুবরাজ নাইথকবীকে একটু দূরের একটা আসনে বসতে বললেন। নাইথকবী লজ্জায় খানিকটা জড়সড় হয়ে একটু দূরের আসনে নীচের দিকে চেয়ে বসল। যুবরাজ আনতমুখী নাইথকবীর সুন্দর মুখটির দিকে খানিক্ষণ এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। তারপর নিজেই কথা তুললেন। যুবারাজ বলতে লাগলেন — নাইথক, তোমাকে যখন থেকে দেখেছি তখন থেকেই আমি একটা কথা ভাবছি। তোমার মত গুণবতী মেয়ে এ রাজ্যে আর দ্বিতীয়টি নেই। তোমার রূপ গুণই তোমাকে রাজরাণী করবে। তুমি রাজরাণী হবার যোগ্যা। রাজার ঘরেই তোমাকে মানাবে ভাল। তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে, তবে আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। বিয়ের কথা শুনেই নাইথকবী লজ্জায় ঘর থেকে দৌড়ে বের হয়ে গেল। যুবরাজ এসব কি বলছেন ! সত্যিই কি তিনি আমাকে বিয়ে করবেন! রাজী না হলেও অবশ্যি গত্যান্তর নেই। হয়ত জোর করেই নিয়ে যাবেন। নিয়ে গেলেও দেশের রাজার উপর কেউ কোন কথা বলবে না। রাজারাতো হামেশাই এভাবে বিয়ে করছেন। নয়ত জোর করে নিয়ে গিয়ে রাজ বাড়ীতে দাসী করে রাখছেন। হয়তবা যুবরাজ আমার মন পরীক্ষা করে দেখছেন। যাই হোক, নাইথকবী ভাবল, যুবরাজের মনের ভাব আরও একটু ভাল করে জেনেই নেওয়া যাক। এবং সম্মতি যদি দিতে হয় তারপরেই দেওয়া যাবে। একমাত্র রাণী করে যদি নেয় তাহলেই আমি রাজী হব । নয়ত কিছুতেই নয়।

দুপুরের খাওয়া দাওয়া এবং বিশ্রামের শেষে বড় হাজারী এবং ছোট হাজারী যুবরাজকে প্রণাম করে এসে দাঁড়াল। যুবরাজ বিনন্দিয়াদের সকলের খাওয়া দাওয়া হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। এমন সময় ছাদ্রাই সেনাপতি তার ভাই ছদাবাইকে নিয়ে এসে যুবরাজকে প্রণাম

করল। যুবরাজ বিছানার উপর আরাম করে বসলেন। এবার সুরু হল কাজের কথা। যুবরাজ ছাদ্রাই সেনাপতির আতিথেয়তায় যারপর নাই সন্তুষ্ট হয়েছেন। তাই তিনি বললেন, সেনাপতি তোমার এখানে দিনটাতো বেশ আরামেই কাটানো গেল। কিন্তু এতক্ষণ কাজের কথাতো কিছুই জিজ্ঞাসা করা হয়নি। আচ্ছা, সেনাপতি তোমাদের পাড়ার লোকেরা রীতিমত যুদ্ধবিদ্যা শিখেছেতো? সেনাপতি বলল, আজ্ঞে, ধর্মাবতার যুবরাজ, যুবকেরাতো সবাই অস্ত্র চালনা, তীর ধনুক ছোড়া শিখেছে। এমনকি আমাদের পাড়ার মেয়েরাও অস্ত্র চালনা, তীর ধনুক ছোড়াতে রীতিমত পারদর্শী হয়ে উঠছে। আমার মেয়ে নাইথকবীই ওদের শেখাচ্ছে। মেয়ের কথা বলতে গিয়ে সেনাপতির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যুবরাজ খুশী হয়ে বললেন, বেশ, বেশ শুনে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে রাজ্যের ছেলে বুড়ো সবারই অস্ত্র চালনা এবং তীর ধনুক ছোড়াতে পারদর্শী হতে হবে। আমি চাই আমার রাজ্যের প্রতিটি ঘরে ঘরে ছেলে মেয়ে সবাই আত্মরক্ষায় পারদর্শী হয়ে উঠুক। এ পাড়ায় মেয়েরাও অস্ত্র চালনা শিখছে শুনে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে । নাইথকবী আছে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। ইতিমধ্যেই নাইথকবীর আরও গুণের পরিচয় আমি পেয়েছি। মেয়েকে অস্ত্র চালনা শিক্ষা দিয়ে ভালই করেছে সেনাপতি। সেনাপতি বলল - মেয়েরও এ ব্যাপারে খুব সখ কিনা, তাই তাকে না শিখিয়ে থাকতে পারিনি। তাছাড়া প্রায়ই কুকি, কাইপেং ও অন্যান্যেরা আমাদের উপর হামলা করে থাকে। তখন বাধ্য হয়ে পাড়া ছেড়ে আমাদের চলে যেতে হয়। এখান থেকে রাজধানী অনেক দূর বলে খবর দেওয়ারও সময় পাওয়া যায় না। যুবরাজ বললেন, হ্যাঁ এ সমস্ত বিরক্তিকর অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদের প্রত্যেকেরই যুদ্ধ বিদ্ধা শেখা প্রয়োজন। এ জন্যই আমি পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি এবং রাজ্যের প্রজাদের আরও ভালভাবে যুদ্ধবিদ্যা শিখতে উৎসাহিত করছি। এ ছাড়া তারা কতটুকু শিখল তাও ঘুরে ঘুরে দেখছি। যেখানে যেখানে অস্ত্র দেওয়ার প্রয়োজন নতুন অস্ত্র তৈরী করে দেওয়ারও ব্যবস্থা করছি। বাবা মহারাজকে যখন যা হচ্ছে জানিয়ে তার বন্দোবস্ত করছি। আমাদের প্রতিবেশী শত্রুদের দমন করে যে করেই হোক আমাদের দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতেই হবে।

যুবরাজ মহারাজার এসব কথা শুনে বুড়ো বয়সেও ছাদ্রাই সেনাপতির রক্ত টাবগ করে উঠে। সে বলতে থাকে, যুবরাজ মহারাজ, আমিওতো তাই চাই। আমার জীবনে বহু যুদ্ধ করেছি। কিন্তু কোথাও পরাজিত হয়ে আসিনি। প্রতিবেশী রাজ্য হেড়ম্ব, আরাকান প্রভৃতি আমাদের সাথে কত যুদ্ধ করেছে। কিন্তু কোনদিন আমাদের পরাজিত করতে পারেনি। কুকিরা সময় সময় অত্যাচার করে থাকলেও কোনদিন আমাদের সাথে মুখোমুখি যুদ্ধ করতে সাহস পায়নি। খাবারের অভাব হলেই অবশ্যি ওরা এরকমটা করত। নইলে কুকিরা মহারাজার বশ্যতা স্বীকার করেই চলত। যতবারই কুকিদের অত্যাচারের মাত্রা বেড়েছে ততবারই তার

উপযুক্ত প্রতিবিধান করা হয়েছে। এসব কথা বলতে বলতে ছাদ্রাই সেনপতির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে। যুবরাজও বৃদ্ধ সেনাপতির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, তোমরা এতটুকু করেছ বলেই আজও আমাদের দেশের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রয়েছে। স্বাধীন জাতি বলে আমরা গর্ব করতে পারি।

এরই এক ফাঁকে বড় হাজারী বলল, যুবরাজা মহারাজ, রাজধানী থেকে আমরা বেরিয়ে এসেছি অনেকদিন হল। পাহাড়ে অনেকদিন এক নাগাড়ে থাকাও নিরাপদ নয়। নানা রকম অসুখ বিসুখ করতে পারে। তাছাড়া 'গরিয়া' পূজাও ঘনিয়ে এসেছে। মহারাজও চিন্তা করতে পারেন । আবার আমাদের উপর বিরক্তও হতে পারেন। যুবরাজ উত্তর করলেন — তা ঠিক, যত সত্বর সম্ভব আমাদের এখন বাড়ী ফিরে যাওয়া দরকার। বড় হাজারী তুমি বিনন্দিয়াদের ডেকে আন। তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে যাওয়ার সব ব্যবস্থা কর। যুবরাজ চলে যাবেন শুনে ছাদ্রাই সেনাপতি ব্যস্ত হয়ে বলল — তা হয় না ধর্মাবতার, আমার বাড়ীতে দয়া করে যখন এসেছেনই, তখন আরও কয়েকটা দিন না থেকে গেলে মনে ভয়ানক ব্যথা পাব। কতদিন পর আপনাদের দেখেছি। আবার কবেই বা আসবেন। আমার এ অনুরোধ আপনাদের রাখতেই হবে। আমার বাড়ীতে এসেছেন জানলে মহারাজ বিরক্ত হবেন না বা আপনাদেরও কিছু বলবেন না। ছাদ্রাই সেনাপতি বড় হাজারীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, এত তাড়া কেন বড় হাজারী? আরও কয়েকদিন এখানে না বেড়িয়ে গেলে আমি কিছুতেই তোমাদের যেতে দিচ্ছি না। তোমাদের হয়ত খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে খুব কষ্ট হচ্ছে। তাই যাওয়ার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছ। বড় হাজারী ব্যস্ত হয়ে সেনাপতির হাত ধরে বলল, ও কথা বলবেন না সেনাপতি। আমরা আপনার এখানে খুব আরামে কাটাচ্ছি। আমাদের এতটুকু কষ্ট হচ্ছে না। আপনি শুধু শুধু মনে ব্যাথা নেবেন না। মহারাজ বিরক্ত হতে পারেন এই ভেবেই শুধু আমি যাওয়ার কথা বলছি। এ ছাড়া 'গরিয়া' পূজার সময় যুবরাজ রাজধানীর বাইরে থাকলেও মহারাজ বিরক্ত হতে পারেন ভেবেই শুধু আমি যাওয়ার জন্য তাড়া দিচ্ছি। আমি যতটুকু জানি, যুবরাজ মহারাজ 'গরিয়া' পূজার সময় বাইরে থাকলেও পূজার কোন ব্যাঘাত ঘটবে না। নিয়মানুসারে পূজাতো হবেই— বলল সেনাপতি। এ ছাড়া যুবরাজ মহারাজ আমার এখানে আছেন জানলে মহারাজ এতটুকু চিন্তা করবেন না। এতক্ষণ যুবরাজ বড়হাজারী এবং সেনাপতির কথাবার্ত্তা শুনছিলেন। এবার তিনি কথা বললেন। শোন বড় হাজারী, আমি সেনাপতির বাড়ীতে আছি জানলে বাবা মহারাজ নিশ্চয় নিশ্চিন্ত হবেন। তা ছাড়া সেনাপতিও যখন এতকরে বলছে তখন আরও কয়েকটা দিন এখানে থেকে আমি গাঁয়ের ছেলেদের যুদ্ধবিদ্যা আরও খানিকটা তালিম দেওয়ার ইচ্ছা করছি। তুমি বরং বিনন্দিয়াদের নিয়ে রাজধানীতে ফিরে যাও । বাবা মহারাজকে তুমি সবকিছু বুঝিয়ে বলবে। তা হলেই সব দিক রক্ষা পাবে

আশা করি। এ ব্যবস্থায় সবাই সম্মতি জানাল। পরদিনই বড় হাজারী বিনন্দিয়াদের নিয়ে রাজধানীর দিকে রওনা দিবে ঠিক হল। সেভাবেই যাওয়ার ব্যবস্থা করতে সবাই লেগে গেল।

পরদিন বড় হাজারী বিনান্দিয়াদের নিয়ে রাজধানীর দিকে চলে গেল। যথাসময়ে মহারাজ ছেংকারাকদের (যোদ্ধাদের) নিয়েই যুবরাজের খবর পেয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। বড় হাজারী পাহাড়ের প্রজাদের যুদ্ধবিদ্যা শেখার কথা, আর্থিক অবস্থা সব কিছু বিশদভাবে মহারাজার সমীপে নিবেদন করল। মহারাজ ছাদ্রাই সেনাপতির যাবতীয় সংবাদ খুটিয়ে খুটিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। বড় হাজারী সবশেষে বলল সর্দারের মেয়ে নাইথকবীর কথা। সে বলল, যুবরাজ একদিন একটা শূকর শিকার করতে ধাওয়া করেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু করে উঠতে পারছিলেন না। শূকরটা যাওয়ার পথেই ছাদ্রাই সেনাপতির মেয়ে নাইথকবী অন্যান্যদের সঙ্গে বনের তরিতরকারী তুলছিল। হঠাৎ শূকরটাকে কিছুদূর দিয়ে দৌড়ে যেতে দেখেই অব্যর্থ সন্ধানে একবারেই শূকরটাকে ধরাশায়ী করে ফেলল। আশ্চর্য মেয়ের হাতের নিশানা। আমরা সবাই অবাক হয়ে গেছি মেয়ের তীরধনুকে এতটা নিপুণতা দেখে। আরও আশ্চর্যের কথা, সেনাপতির মেয়েটিই নিজেই মেয়েদের একটি দল তৈরী করে যুদ্ধবিদ্যা শেখাচ্ছে । যুবরাজ মহারাজও পাড়ার ছেলে মেয়েদের আরও ভালভাবে তালিম দেওয়ার জন্যই ছাদ্রাই সেনাপতির পাড়ায় রয়ে গেছেন। রাজ্যের মেয়েরা পর্যন্ত যুদ্ধবিদ্যা শিখছে শুনে মহারাজা যারপর নাই খুশী হলেন। সব শুনে মহারাজা বড় হাজারীর উপর খুব সন্তুষ্ট হয়ে তাকে আলং হাজারীর পদে উন্নীত করলেন। ছোট হাজারী ছম্প্রাইকে উন্নীত করলেন খাড়াইতিয়া সৈন্যের সেনাপতিরূপে। অতঃপর মহারাজ মহামন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতির সাথে রাজকার্য সম্বন্ধে বিভিন্ন আলোচনা করে অন্তপুরে চলে গেলেন।

পরদিন আগের দিনের কথামত জুমের পাশে গাঁয়ের মেয়েরা সব জড় হল। খুব ভোরেই বিভিন্ন প্রকার অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে নাইথকবী সেখানে চলে গেল। আজ যুবরাজ মহারাজ মেয়েরা কতটুকু যুদ্ধবিদ্যা শিখেছে দেখতে যাবেন। তার জন্যই এতটা প্রস্তুতি । ঘুম থেকে উঠে যুবরাজ নাইথকবীর তৈরী করা ''আওয়ান ভাংগুই'' (বনের এক প্রকার পাতায় জড়িয়ে বিন্নি চাল দিয়ে এ ধরনের পিঠা তৈরী করা হয়) দিয়ে জলযোগ সেরে বৃদ্ধ সেনাপতি ও ছোট হাজারীকে সংগে নিয়ে মেয়েদের অস্ত্র চালনা দেখতে গেলেন। মেয়েরা একে একে তাদের তীর ধনুক নিক্ষেপ, বল্লম ছোড়া ও খড়্গ চালনায় পারদর্শিতা দেখাল। তিন জনেই জুমের একটা উচু টিলাতে দাঁড়িয়ে সব দেখল। যুদ্ধবিদ্যা দেখা শেষ হলে যুবরাজ সেনাপতি ও ছোট হাজারীকে নিয়ে পাহাড়ী পথে জুমের এদিক ওদিক খানিকটা ঘুরে বেড়িয়ে বেশ বেলা হলে বাড়ীতে ফিরে এলেন।

বাড়ীতে এসে ছোট হাজারী ও যুবরাজকে দেখলেন ওদের চ্যানের, খাওয়া দাওয়ার

সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে আছে । নাইথকবীর নির্দেশ মতই ওর খুড়তুত বোন ছদারাই সর্দারের মেয়ে পুনাং ছোট হাজারীর বিভিন্ন কাজকর্ম করে দিচ্ছে, সেবা যত্ন করছে। আর নিজে নিয়েছে যুবরাজের পরিচর্চার ভার। দু'জনের সেবাযত্নে যুবরাজ ও ছোট হাজারীর কিছু মাত্র কষ্ট হচ্ছিল না। এভাবে তাদের দিন বেশ সুখেই যাচ্ছিল।

দেখতে দেখতে বছরটা শেষ হয়ে এল। গরিয়া পূজার আর বেশী দেরী নেই। ঘরে ঘরে তারই তোড়জোড় চলছে। ছোট বড় সবার ঘরেই মদ তৈরী হচ্ছে । বুড়োরাও যেন নতুন বছরের আগমনে নিজেদের বয়সের অস্তিত্ব ভুলে গেছে। 'ছিল্কা-ছিল্কি'দের তো আর কথাই নেই। ছাদ্রাই সেনাপতির পাড়াতেও তার ঢেউ লেগেছে। এবার যুবরাজ মহারাজ আছেন বলে ছাদ্রাই সেনাপতি আরও ঘটা করে গরিয়া উৎসব পালন করবে বলে মনস্ত করেছে। এবং সেভাবেই সব ব্যবস্থাদি করতে লোক লাগিয়েছে।

আজ গরিয়া পূজার দিন। তিন পাড়ায় প্রায় সকল মেয়ে-ছেলে, বুড়োরা গতকাল রাত থেকেই ছাদ্রাই সেনাপতির বাড়ীতে এসে জড় হয়েছে। পান ভোজনের সর্বাঙ্গীন ব্যবস্থায় লেগে রয়েছে উপস্থিত লোকেরা যাতে কোথাও কোন খুত না থাকে। সাথে সাথে কিছু কিছু মদও খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নিচ্ছে। সারারাত খুব হৈ হুল্লোড় আনন্দ স্ফুর্ত্তির মধে কেটেছে সবার। খুব ভোরে উঠে সবাই চান করে নতুন কাপড় পরে বিরাট একটা ঘরে এসে জমা হল। সামনেই বিরাট সিংহাসনের মত এক মঞ্চ তৈরী করা হয়েছে বাঁশ দিয়ে বিভিন্ন ফুল তুলে। এর উপর যুবরাজ বসবেন। কিছুক্ষণ পর ছাদ্রাই সেনাপতি, তার ছোট ভাই ছদরাই ও আরও কয়েকজন গিয়ে যুবরাজ মহারাজকে এগিয়ে আনতে চলে গেল। ওদের সংগে যুবরাজ মহারাজ লম্বা ঘরটাতে এসে ঢুকলেন। সংগে ছোট হাজারীও এল। সেনাপতি অভ্যর্থনা করে যুবরাজকে সিংহাসনে নিয়ে বসাল। তার পাশেই বসল ছোট হাজারী। যুবরাজ ঘরে ঢুকতেই সবাই গড় হয়ে মহারাজকে প্রণাম জানাল। যুবরাজ মহারাজ সিংহাসনে বসলে, তার সামনে কিছু উৎকৃষ্ট মদ এনে রাখা হল। অন্যান্যদেরও দেওয়া হল। যুবরাজ মহারাজার 'আরক' (মদ) পান সুরু দিয়ে আজকের উৎসব সুরু হল। তাঁর খাওয়া শুরু হলেই অন্যান্য উপস্থিত প্রজারা অনুমতি নিয়ে খাওয়া সুরু করল। যুবরাজ মহারাজ মদ খাওয়াতে খুব একটা অভ্যস্ত নয় বলে কিছুক্ষণ খাওয়ার পর মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করতে লাগল। তিনি যেন আর বসে থাকতে পারছেন না। তাই ঘরে ফিরে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত এই ভেবে তিনি সবার কাছ থেকেই বিদায় নিয়ে ছোট হাজারীর কাঁধে ভর দিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে এলেন। ছোট হাজারীর নেশা হলেও এতটা হয়নি। বুদ্ধিমান যুবক ছোট হাজারী ছম্প্রাই । সে দেখল যুবরাজের কাছে কথাটা পাড়ার এটাই প্রকৃষ্ট সময়। তাই সে কৌশলে যুবরাজকে বলল, যুবরাজ মহারাজ

আপনার কাছে আমার কোন প্রার্থনাই আজ পর্যন্ত বিফল হয়নি। আশা করি আজও হবে না। তাই বলছিলাম কি আপনি যদি অনুমতি করেন এবং সেভাবে বলে দেন তাহলেই আমি ছদারাই সর্দারের মেয়ে পুনাংকে বিয়ে করতে পারি। যুবরাজ বললেন, নিশ্চয়ই , নিশ্চই। এতো খুব আনন্দের কথা। আমাকে কি করতে হবে বল। ছোট হাজারী আবার বলল, আপনি যদি দয়া করে ছাদ্রাই সেনাপতি ও তার ভাই ছদারাইকে বলে দেন তা হলে ওরা নিশ্চয়ই আপত্তি করবে না। সাথে সাথেই যুবরাজ ছাদ্রাই সেনাপতি ও তার ভাই পুনাংতির বাবা ছদারাইকে ডাকালেন। ওরা দুজনে এলে যুবরাজই কথাটা পাড়লেন। সেনাপতি তোমাদের একটা বিশেষ প্রয়োজনে ডাকিয়েছি। ছোট হাজারী আমার খুব প্রিয় পাত্র তাতো জানোই। তার সাথে তোমার ভাইয়ের মেয়ে পুনাংতির বিয়ে দিতে চাই। তোমাদের যদি কোন আপত্তি না থাকে তা হলে বিয়ে ঠিক করে ফেলতে পারি। আনন্দের আতিশয্যে প্রথম খানিকক্ষণ সেনাপতির মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরুল না। কিছুক্ষণ পর সে বলল, যুবরাজ মহারাজ, আজ 'গরিয়া' পূজার দিন। এমনিতেই আপনার উপস্থিতিতে আমাদের মন আনন্দে কানায় কানায় ভরে আছে তার উপর আপনি যে প্রস্তাব দিলেন সে আনন্দকে তা আরও দ্বিগুন বাড়িয়ে দিল। আপনি ধর্মাবতার, আপনার আদেশ কি আমরা অমান্য করতে পারি? আপনি যা আদেশ করবেন তাই আমরা মাথা পেতে নেব। আপনি যেদিন বলবেন সেদিনই আমার ছদারাই তার মেয়ে পুনাংতিকে ছোট হাজারীর হাতে তুলে দেবে। তার পক্ষে ছোট হাজারীর মত বীর, যোদ্ধা, সুন্দর যুবককে জামাই হিসাবে পাওয়াতো মহা আনন্দের কথা। সেদিনই ছোট হাজারীর সাথে পুনাংতির বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। পুনাংতির সাথে বিয়ে ঠিক হওয়াতে ছোট হাজারীও খুব খুশী হল।

দু'একদিন পর যুবরাজ একদিন ছোট হাজারীকে বলল, ছোট হাজারী— মেয়েদের অস্ত্রবিদ্যাতো যাহোক দেখা গেল, ওরাতো মোটামুটি ভালই আয়ত্ব করেছে। এবার ছেলেরা কতটুকু শিখেছে তাওতো দেখা দরকার। তুমি পাড়ার ছেলেদের বলে দাও আমি আগামীকাল সকালে ওদের সকলের যুদ্ধবিদ্যা দেখব। ওরা যেন জুমের ধারে ঢালু জায়গাটাতে জড় হয়। ছদারায় সর্দারের ছেলে ছাকলুমই পাড়ার ছেলেদের সবাইকে বলে দিল। পরদিন সকালে যুবরাজ খেয়েদেয়ে ছোট হাজারীকে সংগে নিয়ে ছেলেদের অস্ত্রবিদ্যা দেখতে গেলেন। একে একে বল্লম ছোড়া, তীর ধনুক ছোড়া, তরবারী চালনা সবই দেখা হল। ছেলেদের মধ্যে ছাকলুম খুব পারদর্শিতা দেখাল। কাজেই যুবরাজ ছাকলুমকেই ছেলেদের দলের প্রধান বানিয়ে দিলেন। আগের দিনে যে সব যোদ্ধা বা সেনাপতি যুদ্ধে বীরত্ব না দেখিয়ে পিছন দিকে সরে আসত কিংবা পরাজিত হয়ে ঘরে ফিরে আসত তাদের প্রত্যেককে একটা একটা করে চরখা দিয়ে দেওয়া হত। সেদিনে মেয়েরাই শুধু চরখা কাটত। ছেলেদের পক্ষে কিংবা বীরের পক্ষে এটা

ছিল খুবই হীন বা লজ্জার কাজ; তাই পরাজিত যোদ্ধাকে এভাবে কৌশলে লজ্জা দিয়ে বলা হত তোমার পক্ষে মেয়েদের কাজই মানান সই। যুদ্ধ করা তোমার শোভা পায় না। কাজেই এ চরখা নিয়ে ঘরে গিয়ে তুমি মেয়েদের সাথে চরখা কাটতে থাক। এ ধরনের লজ্জা পাওয়াকে যোদ্ধা মৃত্যুর চেয়েও অধিক অবমাননাকর মনে করত। এ লজ্জার কথা মনে রেখে প্রত্যেক 'ছেংকারাক' বা ত্রিপুরী যুবকই খুব ভাল করে যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ব করত যাতে শত্রুর হাতে তাকে কখনই পরাজিত হতে না হয়। যুবরাজ পাড়ার ছেলেদের উপদেশের ছলে সে কথাও মনে করিয়ে দিলেন। সমবেত যুবকেরাও যুবরাজের কাছে ভাল করে অস্ত্রবিদ্যা শিখবে বলে প্রতিজ্ঞা করল।

যুবরাজ সেনাপতির বাড়ীতে এসেছেন অনেক দিন হয়ে গেছে। এবার রাজধানীতে ফেরা দরকার। বৃদ্ধ মহারাজ সব সময় সুস্থ থাকেন না। রাজকার্য সব সময় ভালভাবে দেখাশুনাও সম্ভব হয়ে উঠে না। ওদিকে রাজধানী থেকেও জরুরী খবর এসেছে, আরাকান দেশের রাজা ত্রিপুরা রাজ্যের বিরুদ্ধে এক বিশাল সেনাবাহিনী সাজিয়েছেন। যে কোনসময় ঝাপিয়ে পড়তে পারেন। কাজেই যুবরাজের অনতিবিলম্বে রাজধানীতে ফিরে আসা দরকার। সেদিন বিকাল বেলা যুবরাজ ছাদ্রাই সেনাপতিকে ডেকে তার রাজধানীতে ফিরে যাওয়ার কথা জানালেন। একথা শুনে ছোট বড় সবাই খুব দুঃখিত হল। এদ্দিন যুবরাজকে তারা খুব কাছে পেয়েছিল একজন নিজের মানুষ হিসাবে। তিনি রাজধানীতে ফিরে যাবেন। সবচেয়ে বেশী কষ্ট হতে লাগল নাইথকবী ও পুনাংতির। যাওয়ার আগের দিন রাত্তিরে যুবরাজ সেনাপতিকে কথাপ্রসঙ্গে বলল, সেনাপতি, ছোট হাজারীর সাথে পুনাংতির বিয়েতো ঠিক করাই আছে। পরে এক সময়ে ছোট হাজারী এসে পুনাংতিকে বিয়ে করে নিয়ে যাবে। আর তোমার মেয়ে নাইথকবীর বিয়ে কিন্তু আমাকে না জানিয়ে ঠিক করবে না। আমিই ওর বর ঠিক করে দেব। তোমাকে তারজন্য চিন্তা করতে হবে না। বৃদ্ধ সেনাপতি, যে আজ্ঞে যুবরাজ মহারাজ, আপনি যেভাবে আদেশ করবেন সেভাবেই হবে বলে মাথা নিচু করে বসে রইল। যুবরাজ চলে যাবেন এ ব্যাথাই যেন সে কিছুতেই সামলে উঠতে পারছিল না।

পরদিন যুবরাজ ছোট হাজারী ও সঙ্গীয় বিনন্দিয়াদের নিয়ে রাজধানীর দিকে রওনা হবার জন্য প্রস্তুত হলেন। পাড়ার ছেলেবুড়ো সবাই যুবরাজকে প্রণাম জানাতে এল। নাইথকবী ও পুনাংতিও এল সকলের সাথে । যুবরাজকে প্রণাম জানাতে গিয়ে নাইতকবী ও পুনাংতির চোখে জল নেমে এল। কিছুই যুবরাজের চোখ এড়াল না। তিনি নাইথকবীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, কেঁদনা নাইথক, আমিতো আবার সহসাই ফিরে আসব। সকলের অগোচরে খুব আস্তে আস্তে যুবরাজ নাইথকবীকে বললেন, আমি কিছুদিনের মধ্যেই ফিরে এসে তোমাকে রাজরাণী করে নিয়ে যাব। পাছে নাইথকবীর কান্না দেখে যুবরাজের মন আরও দুর্বল হয়ে

পড়ে তাই তিনি তাড়াতাড়ি ঘোড়ায় চড়ে লাগাম ধরে বসলেন। সঙ্গীয় লোকজনেরাও তাঁর অনুসরণ করল। যুবরাজের ঘোড়া চলতে লাগল পাহাড়ী পথ বেয়ে । ছাদ্রাই সেনাপতির পাড়ার লোকেরা যুবরাজের জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলল। এক সময়ে বনের পথে রাজপুত্র সঙ্গীয় লোকজনদের নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন । যেখানে নাইথকবীরা অস্ত্রবিদ্যা শিখত তারই পাশে পুরাতন জুমটার গায়ে দাঁড়িয়ে ওরা সবাই যুবরাজের যাওয়ার পথের দিকে অশ্রু সজল চোখে চেয়ে রইল।

যুবরাজ রাজধানীতে ফিরে আসা মাত্রই বৃদ্ধ মরারাজ তাকে ডেকে পাঠালেন। যুবরাজ বাবা মহারাজকে প্রণাম করে এদ্দিন রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে কি কি কাজ করেছেন তার একটা হিসাব দিলেন। পাড়ায় পাড়ায় যুবকেরা বিভিন্ন অস্ত্র চালনায় কতটুকু পারদর্শিতা অর্জন করেছে তারও বিশদ বর্ণনা দিলেন। কথা প্রসঙ্গে বৃদ্ধ মহারাজ যুবরাজকে বললেন, বাবা, আমি বুড়ো হয়েছি। রাজ্যের নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ কাজ সব সময় ঠিক ঠিক দেখাশুনা করতে পারি না। তুমি আমার উপযুক্ত ছেলে, রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকার। এখন থেকে তোমাকেই ওসব দেখাশুনা করতে হবে। বর্তমানে রাজ্যের বড় দুর্দ্দিন। শুনেছি, আরাকান রাজা বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের দিকে এগিয়ে আসছে। তোমাকেই তার মোকাবিলা করতে হবে। তুমি মহামন্ত্রী এবং প্রধান সেনাপতির সঙ্গে আলোচনা করে ছেংকারাকদের নিয়ে আজই দক্ষিণে রওনা হয়ে যাও। তুমি দেশের ভাবী অধিপতি। রক্ত দিয়ে দেশের স্বাধীনতা তোমাকেই রক্ষা করতে হবে। তাই আর বিলম্ব করো না বাবা, যত সত্তর সম্ভব তুমি যুদ্ধের ব্যবস্থা করে ফেল। এগিয়ে যাও —দেশের ও জাতির মুখ রক্ষা কর। একথা শুনে যুবরাজ মহারাজ সমক্ষেই প্রধান সেনাপতি ও মহামন্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন। ওরা এলে যুদ্ধের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা হল। ঠিক হল যুবরাজ আপাততঃ পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে আরাকান রাজাকে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে যাবে। পরবর্ত্তীকালে প্রয়োজনবোধে আরও সৈন্য যুবরাজের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত রাখা হবে। শরীর বিশেষ ভাল নেই বলে মহারাজা যুবরাজ, সেনাপতি ও প্রধানমন্ত্রীর উপর যুদ্ধের যাবতীয় ভার দিয়ে অন্দর মহলে চলে গেলেন।

রাজ্যময় একটা সাজ সাজ রব পড়ে গেল। কামারশালা দিনরাত কাজ করে বিভিন্ন ধরণের আরও প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র বানাল। প্রধানমন্ত্রী 'ওয়াথলং' (আগেরদিনে পাহাড়ী প্রজাদের এ চিহ্নটি পাঠিয়ে যুদ্ধের জন্য ডেকে আনা হত। এ চিহ্নটি দেখলেই প্রজারা বুঝে নিত কোথাও যুদ্ধের জন্য তাদের ডাকা হচ্ছে। ওদের যেতে হবে। এ ধরণের আর একটি প্রতীক হল 'ফুরাই'। একমাত্র মহারাজাই 'ফুরাই' পাঠাতে পারতেন। মহারাজা ব্যতীত আর সবাইকেই

'ওয়াথলং' ব্যবহার করতে হত। এ আমন্ত্রণ পেয়ে যদি কোন শক্ত সমর্থ যোদ্ধা যুবক যুদ্ধে যেতে আপত্তি জানাত তবে তাকে রাজবাড়ীর বিনন্দিয়ারা এসে ধরে নিয়ে যেত। তার ভাগ্যে জুটত অশেষ লাঞ্ছনা) পাঠিয়ে দিল পাড়ায় পাড়ায়। রাজ্যময় সবাই যেন জেগে উঠল - যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। আবার এর মাঝে মাঝে শোনা যেতে লাগল কান্নার রোল। কত মায়ের বুক শূন্য করে ছেলে হয়ত চিরদিনের জন্য চলে যাচ্ছে। সদ্য বিবাহিত স্ত্রীকে বিদায় জানাতে হচ্ছে তার প্রিয়তমকে। হয়ত আর কোনদিনই ঘরে ফিরে আসবে না সে। ছাদ্রাই সেনাপতির পাড়াতেও 'ওয়াথলং' পৌঁছল। পাড়ার যুবকেরা সবাই যুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। নাইথকবীই সবাইকে উৎসাহ দিয়ে, সাহস দিয়ে তৈরী করে দিল। আজ তার কত আপসোস! সে মেয়েলোক বলেই না আজ যুদ্ধে যেতে পারছে না। ছেলে হলে তো সেও পাড়ার ছেংকারাকদের সঙ্গে আজ যুদ্ধে যেত। রাজপুত্রের পাশে দাঁড়িয়ে জীবন মরণ লড়াই করত শত্রুর সাথে। শত্রুকে চরম আঘাত হেনে পর্যুদস্ত করে বীরবেশে দেশের মাটিতে ফিরে আসত। আবার সে ভাবছে, নাইবা সে যুদ্ধে যেতে পারল। বাড়ীতে থেকে যোদ্ধাদের মনে সাহস দিয়ে উৎসাহ দিয়ে তাদের যুদ্ধে পাঠানোও তো কম কথা নয়। এটাওতো যুদ্ধেরই একটা বিশেষ অংগ। তাই সে মনোযোগ দিয়ে তার কাজ করে যেতে লাগল। আর যোদ্ধাদের অনুপস্থিতিতে গ্রাম রক্ষার ভার নিল নিজের হাতে। এ কাজে তাকে সাহায্য করবে গাঁয়ের 'ছিক্লা' মেয়েরা।

যাওয়ার দিন খুব ভোরবেলা পাড়ার 'ছেংকারাক' যুবকেরা সবাই এসে জমা হল ওদের দলপতি ছাকলুমের বাড়ীতে । গতবারই ছাকলুম বিয়ে করেছে। ছেলে মেয়ে এখনও কিছু হয়নি। ওরা সবাই রওনা হলে পাড়ার মা বোনেরা হাপুস নয়নে এগিয়ে দিতে এসে বেশ খানিকটা পথ সংগে সংগে এল। ছাকলুমের নতুন বিবাহিত স্ত্রীর বুক ফাটা আর্ত্তনাদে বার বারই ছাকলুম থমকে দাড়াচ্ছিল, পিছন ফিরে চাইছিল। ছাকলুমের স্ত্রী কাঁদছে আর বলছে -

নুংবাই কাইজাকমা হায়া বাইয়াখ;
হায়ালে খায়া হাফলক্ অংবা
নুংবায় কাইজাকমা বেদী বাইয়াখ
বেদী মুইবেরা ছংবা।
কলিজা —
নুংবাই কাইজাকমা মেথি কাগইয়াখ
হাচিখুং রাইবার চংবা
নুংবাই কাইজাকমা হন্তা কাগইয়াখ

চালিখুং রাইবার চংবা।
অ কলিজা —
নুংবাই কাইজাকমা — রিত্রাক থানছা থুলে থুমামুন
তাকা কেবেংগ নুংবাই।
য়্যাকুং জাংলা ছুরয় থুখামুন
য়্যাকতুক কেরেংগ নুংবাই।
দুমা বাইছানি ছেবা ছিয়াল
(কলিজা-ন) হাচিখুং রাবাইর চংবা
নুং থাংথানি আংব ফাইয়ানু
য়্যাকুং ছুনানি জরা চুগনাদে
আনব তুইদি লগি।

নিনি কতকনি খুই কালাইখানি
আনিব কালাইনানি —
অ কলিজা ; আনব তুইদি লগি।

অনুবাদ ঃ- তোমার সাথে যে বিয়ে হয়েছে তার 'ছায়া' (বিয়ের সময় তৈরী মাটির বেদী) এখনও ভাঙেনি এখনো তা মাটির ঢিপি হয়ে আছে। তোমার সাথে যে বিয়ে হয়েছে তার বেদীর চিহ্ন এখনও লোপ পায়নি — বেদীর বাঁশগুলো তরকারি বাগানের বেড়া হয়ে আছে। ওগো প্রিয়তম আমাদের যে বিয়ে হয়েছে তার গন্ধতেলের ঘ্রাণ এখনও মিলায়নি। এর মধ্যেই তোমার ডাক এসেছে হাচিখুং এর যুদ্ধে যাবার জন্য । তোমার সাথে বিয়ে হয়েছে - মনে আমার কত সাধ। একই পাছড়ায় দু'জনে শুতে গেলে পাছড়ায় কিনারার সূতোগুলো বাদ সাধে। সটান পা মেলে পাশাপাশি মাথা রেখে যে শোব, তাও হাতগুলো মাঝখানে থেকে বাদ সাধে।

আজও এক ছিলিম তামাক সেজে খাইয়ে সেবা করার যোগ্য হয়নি, এর মধ্যে এসে গেল তোমার যুদ্ধে যাবার ডাক !

তুমি যেখানে যাবে আমিও সেখানে যাব। পা ধুয়ে দেবার যোগ্যও যদিও হই - আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল। তোমার কণ্ঠের রক্ত যেখানে পড়বে, আমার কণ্ঠের রক্তও সেখানেই পড়ুক - ওগো প্রাণ, আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল।

ওদিকে ছাকলুমও চোখের জল রাখতে পারেনি; সেও করুণ সুরে গেয়ে উঠল -

অ কলিজা —
পশ্চিম যাত্রা চুং খালাইনানি —
মুকতুই তা ফুনুকজা দি।
অ কলিজা —
চাইছর ওয়া রময় নুং তনা মা - মগ
রি লামনাখায় বা লামাদি।
মাজাং ওয়া রময় নুং তমা মা মগ
রি লামনাখায় বা বগদি।
বাক্য ওয়া রময় নুং তমা মা মগ্
মাইতুক্ বগানাথায় বা বগদি।

অনুবাদ ঃ- ওগো প্রিয়তমা, পশ্চিম যাত্রায় আমরা যাচ্ছি। এ সময় চোখের জল দেখিও না।

ওগো প্রাণ, 'চাইছর' এর (আলনায়) বাঁশ ধরে মলিন মুখে কি ভাবছ? যদি কাপড় মেলে দিতে হয়তো দাও। 'মাজাং' এর (বিছানাপত্র রাখবার মাচা) বাঁশ ধরে মলিন মুখে তুমি কি ভাবছ? বিছানাপত্র রাখতে হয়তো রাখ । বাকার (হাড়ি রাখার মাচা) বাঁশ ঘরে ম্লান মুখে কি এত ভাবছ ? ভাতের হাড়ি রাখবেতো রাখ।

ছাকলুমের স্ত্রীর খুবই অল্প বয়েস। সাংসারিক বুদ্ধি এখনও পাকা হয়নি। তাই স্বামী যাতে যুদ্ধে না গিয়ে থাকতে পারে তার জন্য বিভিন্ন সম্ভব অসম্ভব পথ বাতলে দিয়ে বলছে —

কলিজা —
দিদা কাইছালে চাকুরি তংগ
দিদা কাইছান ছুংদি।
হাচুক ছাকাং পুনছিকাম তংগ
পুনছিকাম পাইঅই তানদি।
কলিজা —
কংঅয় খুলমদি দংগয় নাদি,
দিদান বিদায় নাদি।
য়্যাগছি খক্বা য়্যাগ্রা খক্বা।
দরগয় নাদি খুলুময় নাইদি

দিদান বিদায় নাদি।

অনুবাদ ঃ- ওগো প্রাণ প্রিয়, তোমার দাদাতো একজন চাকুরী করেন, তার কাছে পরামর্শ নাও। পাহাড়েও রাম ছাগল (পুনছিকাম) পাওয়া যায় তা কিনে পূজা দাও । ওগো প্রাণ ডান হাতে পাঁচটি টাকা ও বাঁ হাতে পাঁচটি টাকা নিয়ে নত হয়ে প্রণাম কর। দাদার কাছে মুক্তি প্রার্থনা কর।

ওদের গান চলছে । ততক্ষণে যুবক যোদ্ধারা পাড়া থেকে অনেক দূরে এগিয়ে গেছে রাজধানীর দিকে; নাইথকবীও পুনাংতি ভাইয়ের বৌকে সান্ত্বনা দিয়ে ঘরে নিয়ে গেল। ওদের মনেও তো আজ একই কান্না আছড়ে পড়ছে। ছোট হাজারীর সংগে পুনাংতির বিয়ে হওয়ার কথা ছিল শীগগীরই — তা পিছিয়ে গেল অনেক দিনের জন্য। যুবরাজও সহসাই নাইথকবীর কাছে ফিরে আসবেন কথা দিয়েছিলেন, তাও কবে হবে দেবতারাই জানেন।

রাজধানী থেকে যুবরাজ পাঁচ হাজার ছেংকারাক ও প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে আরাকান রাজ্যের দিকে চলে গেছেন। ওদিকে আরাকান রাজ্যের সৈন্যগণও ত্রিপুরা রাজ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে গিয়ে যুবরাজ আরাকান রাজের দেখা পেলেন। দু'পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হল। আরাকান মগেরা বন্যার জলের মত ভেসে গেল। যুদ্ধ শেষে ত্রিপুরী ছেংকারাকগণ আরাকানদের প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র খাদ্য সামগ্রী হস্তগত করল। কিন্তু এ যুদ্ধ জয়ই তো শেষ কথা নয়। আরাকানগণ হয়ত আবার শক্তি সংগ্রহ করে ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষতি করতে পারে। তাই যুবরাজ চাইলেন আরাকান রাজার শক্তি চিরদিনের জন্য নষ্ট করে দিতে । ওরা যেন আর কেনাদিনই ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণ করতে সাহস না পায়। তাই যুদ্ধ জয় করেই যুবরাজ দেশের দিকে ফিরে এলেন না। তিনি সেখানেই বিনন্দিয়াদের নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। আর রাজধানীতে আরও ছেংকারাক ও অস্ত্রশস্ত্র চেয়ে খবর পাঠালেন। পাহাড় থেকে আসা অনেক ছেংকারাক ও অস্ত্রশস্ত্র চেয়ে খবর পাঠালেন। পাহাড় থেকে আসা অনেক ছেংকারাক রাজধানীতে অপেক্ষা করছিল। মহামন্ত্রী সে সমস্ত ছেংকারাকদের প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে যুবরাজের সাহায্যের জন্য পাঠিয়ে দিল। নতুন ছেংকারাকগণ যুবরাজের সংগে যোগ দিলে যুব রাজের শক্তি দ্বিগুণ বেড়ে গেল। প্রবল উৎসাহে এবার যুবরাজ আরাকান রাজ্যের ভিতর দিকে অগ্রসর হতে লাগল। ত্রিপুরী সৈন্যগণ যে দিক দিয়ে গেল আরাকানগণ ভয়ে ঘর বাড়ী ছেড়ে বনে জঙ্গলে পালিয়ে গেল। আরাকানগণ যুব রাজের ছেংকারাকদের মুখোমুখি দাঁড়াতেই সাহস পেল না । বেগতিক দেখে আরাকান রাজ যুবরাজের বশ্যতা শিকার করে আর কোন দিন ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণ করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করল। পরাজিত আরাকান রাজ প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে ত্রিপুরার যুবরাজকে সন্তুষ্ট করল।

দেখতে দেখতে বছরটা ঘুরে এল। যুদ্ধক্লান্ত ছেংকারাকগণ মহা আনন্দে দেশে ফিরে এল। যুবারাজ যুদ্ধ জয় করে এসেছেন — তাই রাজ্যময় উৎসব আনন্দের ধুম লেগে গেল। রাজ ভান্ডার খুলে দেওয়া হল ছেংকারাকদের পান ভোজন উৎসব আনন্দের জন্য। পাহাড় থেকে আসা ছেংকারাকগণ প্রচুর পান ভোজন করে টাকা পয়সা নিয়ে যার যার বাড়ীতে ফিরে গেল। যুদ্ধ থেকে যারা ফিরে এসেছে তাদের পরিবারে আজ আনন্দের অবধি নেই; যারা ফিরে আসেনি যুদ্ধে মারা গেছে তাদের পরিবারে কান্নার রোল বয়ে গেল। যুবরাজের মনেও আজ আনন্দের সীমা নেই। মনে প্রচুর আনন্দ থাকলেও যুবরাজ আনন্দ করার মোটেই সময় পেলেন না। এমনকি যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে কয়েকটা দিন যে একটু শান্তিতে বিশ্রাম করবেন তারও ফুরসৎ পেলেন না। যুবরাজের রাজধানীতে ফিরে আসার কয়েকদিনের মধ্যেই বৃদ্ধ মহারাজ রোগ শয্যায় পড়লেন। ফলে সমস্ত রকম আনন্দ উৎসবের আয়োজন বন্ধ হয়ে গেল। সবার মুখেই নেমে এল বিষাদের ছায়া। দিন দিনই বৃদ্ধ মহারাজার অবস্থা খারাপের দিকে যেতে লাগল। যুবরাজ, মহামন্ত্রী ও অন্যান্য নিকট আত্মীগণ সব সময়ই বৃদ্ধ মহারাজার রোগ শয্যার পাশে একপায়ে দাঁড়িয়ে আছেন — কখন কি হয় অবস্থা! রাজ্যের যত ওঝা, বৈদ্য সবাইকে ডাকান হল; কিন্তু কারো ঔষধেই কিছু ফল হল না। একদিন সবাইকে কাঁদিয়ে বৃদ্ধ মহারাজা সজ্ঞানে পরলোক গমন করলেন। রাজ্যের ছোট বড় সব প্রজাই তাদের প্রিয় বৃদ্ধ মহারাজার মৃত্যুতে শোকভিভূত হয়ে পড়ল। মহারাজার মৃত্যুর পর যথারীতি রাজপুরী থেকে যুবরাজকে নতুন মহারাজা বলে ঘোষণা করা হল। মহা সমারোহে মহারাজার অন্ত্যেষ্ঠি ক্রিয়া শেষ হল। শ্রাদ্ধের দিন দীন দুঃখীদের প্রচুর খাওয়ানো হল, দান- ধ্যানও হল প্রচুর পরিমাণে।

বৃদ্ধ মহারাজার শ্রাদ্ধাদি কাজ শেষ হলে একদিন ছাদ্রাই সেনাপতির পাড়া থেকে একজন লোক এক খবর নিয়ে এল। যুবরাজের যুদ্ধে যাওয়া, ফিরে আসার পর বাবার মৃত্যু এসব নানা ধরণের অঘটন ঘটায় ছাদ্রাই সেনাপতি এদ্দিন খবর পাঠাতে ইতস্ততঃ করছিল। এসব ঝামেলা চুকে যাওয়ার পর ছাদ্রাই সেনাপতিই একদিন একজন বিশ্বস্ত লোক দিয়ে মহারাজার কাছে খবরটা পাঠাল। খবর শুনেতো মহারাজা খুবই আশ্চার্যান্বিত হলেন। ছোট হাজারীর ঔরসে পুনাংতির গর্ভে একটি ছেলে হয়েছে। গ্রামবাসীরা পুনাংতির বাবা ওদের কুমারী মেয়ের ঘরে সন্তান হওয়াতে বলতে গেলে একঘরে করে রেখেছে। যুদ্ধের ঝড় ঝামেলাতো চুকে গেছে, এবার মহারাজা যেন ছোট হাজারীকে বলে পুনাংতিকে গ্রহণ করার ব্যবস্থা করেন। সাথে সাথে মহারাজা ছোট হাজারীকে ডেকে খবরের সত্যাসত্য সবকিছু জেনে নিলেন। ছোট হাজারী সবকিছু অকপটে স্বীকার করল। ছাদ্রাই সেনাপতির পাঠানো খবর সম্বন্ধে মহারাজার কোন সন্দেহেই রইলনা। সেদিনই তিনি লোক পাঠিয়ে পুনাংতিকে রাজবাড়ীতে

নিয়ে এলেন। মহারাজা নিজে উদ্যোগী হয়ে অনেক খরচ পত্তর করে ছোট হাজারীর সংগে পুনাংতির বিয়ে দিয়ে দিলেন। ছাদ্রাই সেনাপতি ও তার পাড়ার লোকদের মহারাজার ন্যায় বিচারে আনন্দ আর ধরে না; তারা ধন্য ধন্য করতে লাগল। মহারাজার জয় ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠল।

পুনাংতির বিয়েতে নাইথকবীও এসেছিল। কিন্তু এতলোকের বেড়া ডিঙ্গিয়ে মহারাজার সঙ্গে একটি কথাও বলতে পারেনি। শুধু দূর থেকেই মহারাজকে দেখেছে। এমনকি ছাদ্রাই সেনাপতিও মহারাজার সাথে বিশেষ কোন কথা বলতে পারেনি। মহারাজ যেন ওদের দেখেও দেখেননি, চিনেও চেনেননি। নাইথকবী ভাবে, সত্যিই মানুষের মনের কি পরিবর্তন ! যে মহারাজ একদিন শত শতবার নাইথকবীকে বিয়ে করবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, মহারাজা তাদেরকে চিনতেও পারেন না। সরলমনা নাইথকবী চিরদিন পাহাড়েই থেকেছে, পাহাড়ের পরিবেশেই মানুষ হয়েছে। রাজ অন্তঃপুরের কিংবা রাজা মহারাজার ধরণ ধারণ কিছুই জানা নেই। তাই পুনাংতির বিয়ের পর মনে দুঃখের বোঝা নিয়েই সে তাদের পাড়াতে ফিরে গেল বাবাও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের সাথে। পুনাংতির বর ছোট হাজারী অনেক বলে কয়েও ওদের কিছুতেই রাজধানীতে রাখতে পারল না। মহারাজ কিন্তু গোপনে সব খবরাখবরই রাখছিলেন। তিনি নাইথকবীর মনের ভাবও বুঝতে পারলেন। তিনি শুধু নাইথকবীকে পরীক্ষা করার জন্যই এরকম করছিলেন। তাই তিনি গোপনে নাইথকবীদের রাজবাড়ীতে এসে যাতে কোন প্রকার অসুবিধা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য বড়হাজারীকে আদেশ দিয়ে রেখেছিলেন। গাঁয়ে ফিরে যাবার সময় ছোটহাজারী মহারাজার আদেশ মত ছাদ্রাই সেনাপতিকে নাইথকবীর বিয়ে ঠিক করার আগে তাকে জানাতে বলে দিল। এরমধ্যে ছোটহাজারী মহারাজার মনের ভাব বুঝে নেবে। যদি মহারাজ নাইথকবীকে বিয়ে করতে রাজী না হন তাহলেই যেন অন্য কোথাও নাইথকবীর বিয়ে ঠিক করা হয়। ছাদ্রাই সেনাপতি মহারাজার কৌশল কিছুই বুঝতে পারল না। সে শুধু সম্মতি জানিয়ে বিষণ্ন মনে মেয়েকে নিয়ে গাঁয়ে চলে গেল।

পাঁচ ছমাস হল বৃদ্ধ মহারাজা পরলোক গমন করেছেন। শুভদিনে শুভক্ষণে ঘটা করে মহারাজার অভিষেক হল। যুবরাজ ছেংথুংফা মহারাজা হলেন। সিংহাসনে বসেই রাজা ছেংথুংফা রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে মনোযাগ দিলেন। প্রজাদের সকল প্রকার সুখ সুবিধা বিধান করাই মহারাজার একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রজা মঙ্গলের কাজে তিনি তাঁর বাপ ঠাকুর্দার চাইতেও অনেক বেশী এগিয়ে গেলেন। রাজ্যের প্রজারা সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগল। মন্ত্রী, সেনাপতি, পারিষদেরা মহারাজাকে বিভিন্ন রাজকার্য সম্বন্ধে সময়োচিত পরামর্শ দিয়ে সুষ্ঠুভাবে রাজকার্য পরিচালনায় সাহায্য করতে লাগল।

এভাবে একটা বছর কেটে গেল । মৃত মহারাজার বৎসরান্ত শ্রাদ্ধ হয়ে গেল । মহারাজা ছেংথুংফা কালৌশচ থেকে মুক্তি পেলেন । এক দিন সুযোগ বুঝে মহামন্ত্রী নীরবে মহারাজা ছেংথুংফাকে বললেন, মহারাজ ধর্মাবতার, আপনি যদি অনুমতি করেন তবে আমরা রাজলক্ষ্মী আনার চেষ্টা করি । আপনার আদেশ পেলে রাজ্যের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে রাজরাণীর উপযুক্ত সবচেয়ে সুন্দরী গুণবতী সুলক্ষণা মেয়েটিকে খুঁজে বের করবার জন্য লোক পাঠিয়ে দিই । তারপর দেখেশুনে যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের রাণী মাকে ঘরে আনা প্রয়োজন । রাজলক্ষ্মী ভিন্ন রাজ অন্তঃপুর যে অন্ধকার । আমরা মা ছাড়া বড়ই অসহায় বোধ করছি । সব শুনে মহারাজ কতক্ষণ নীরব থেকে তারপর এক সময়ে বললেন, তোমাদের যদি একান্তই ইচ্ছা হয় তবে দেখতে পার । তবে মেয়ে দেখার আগে ছাদ্রাই সেনাপতির মেয়ে নাইথকবীকেও একবার দেখে নিও । নাইথকবীর কথা বলতে গিয়ে কথা প্রসঙ্গে মহারাজ নাইথকবীর সাথে মহারাজার পরিচয় থেকে শুরু করে ছাদ্রাই সেনাপতির বাড়ীতে থাকা এবং নাইথকবীকে ভালবাসা ও নিজের প্রতিজ্ঞার কথা সবই বললেন । নাইথকবীকে বিয়ে করতে তার কোন অসুবিধা বা আপত্তি নেই । নাইথকবীর ন্যায় গুণবতী নারী এ রাজ্যে খুব কমই আছে । তবে কিনা বিয়ের আগে তিনি নাইথকবীকে চরম ভাবে পরীক্ষা করে নিতে চান । রাজার প্রধানা মহির্ষীর অনেক গুরু কর্তব্য রয়েছে । তাই সে যে রাজ রাণীর যোগ্য তার উপযুক্ত পরীক্ষা মহারাজা পেতে চান । মন্ত্রী পরিষদ এবং রাজ্যের প্রজারা সবাই জানবে নাইথকবীর গুণপণার কথা । এই জন্যই তিনি রাজ্যের পাড়ায় পাড়ায় লোক পাঠিয়ে খোঁজ না নেওয়ার পক্ষপাতী । তার চাইতে বরং রাজ্যে ঢোল পিঠিয়ে জানিয়ে দেওয়া হোক, যে ছিক্লা নারী সূর্য্যের আলোক গংগা ফড়িং উড়লে তার পাখায় যে রং ধরে এবং'যে রকম মসৃণ দেখায় সে রকম একটি 'রিছা' (বক্ষাবরণী) বুনে দিতে পারবে তাকেই মহারাজা বিয়ে করে পটরাণী করবেন । সেই হবে মহারাজর প্রধানা মহির্ষী । সে পরীক্ষায় যদি নাইথকবী উত্তীর্ণ হতে পারেতো ভালই । আর কেউ যদি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নাইই হতে পারে তবে নাইথকবীকেই মহারাজা রাণী করে আনবেন । মহামন্ত্রী মহারাজার যুক্তিকে পুরোপুরি সমর্থন করল । এবং সে ভাবেই কাজ করবে বলে সেদিনের মত চলে গেল ।

কয়েকদিনের মধ্যেই রাজবাড়ী থেকে পাড়ায় পাড়ায় ঢোল পিটিয়ে জানিয়ে দেওয়া হল -- এ রাজ্যের মধ্যে যে ছিক্লা (অবিবাহিত যুবতী) রমনী সূর্যের আলোকে উড়ন্ত গংগা ফড়িং-এর পাখায় রং ধরা এবং সেরকম মসৃণ একটি রিছা তৈরী করে দিতে পারবে তাকেই মহারাজা রাজ্যের পাটরাণী করে নেবেন । রাজ্যের ছোটবড় সব প্রজার কানেই কথাটা গেল । রাজার লোকেরা ছাদ্রাই সেনাপতির পাড়াতেও খবরটা পৌঁছে দিল । খবরটা যথাসময়ে নাইথকবীর কানেও গেল । খবরটা শোনা অবধি নাইথকবী একদম ভেংগে পড়েছে । তার

কান্নার আর বিরাম নেই । সেও পুনাংতির মত হলে মহারাজার নিকট ধরা দিতে পারত । এবং আজ তা হলে পুনাংতির যেমন ছোটহাজারীর সংগে বিয়ে হয়েছে তারও মহারাজার সংগে বিয়ে হয়ে যেত । তাকে আজ এভাবে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাতে হত না । তার কাছে সবচেয়ে অবাক লাগে মহারাজার বিয়ের শর্ত শুনে। এরাজ্যে এমন মিঈ, রং ধরা রিছা বুনতে পারে এমন একটি মেয়েও নেই । দেবতার আশীর্বাদ চাড়া এ কিছুতেই সম্ভব নয় । এমন গুণবতী মেয়ে না পেলে কি মহারাজা বিয়েই করবেন না ? তিনি রাজ্যের রাজা । তিনি কি করে কথা দিয়ে কথা খেলাপ করেন ? এই কি তাঁর ন্যায় বিচার ? এখন থেকে প্রজারা তার ন্যায় বিচারের আর তারিফ করবে না । দিন ভরে নাইথকবীর মা-বাবা ও কাকা তাকে অনেক বুঝাল -- অনেক সান্ত্বনা দিল । চোখের জল বন্ধ হলেও নাইথকবীর মনের জ্বালা জুড়াল না । নানা কথা ভাবতে ভাবতে রাত্তিরে কিছু না খেয়েই নাইথকবী ঘুমিয়ে পড়ল । রাত্তিরে নাইথকবী এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল । সে দেখল, তাদের পুরানো জুমটার পাশেই যেখানে 'খুম রুংখু' গাছটা ফুলে ফুলে ঝেফে আছে । ঠিক তার উপর দাঁড়িয়ে সে যেন এক সময়ে পাখা মেলে নীল আকাশে উড়ে গেছে । সে যতদূর উড়ে গেছে 'নাঐ' পাখীরাও ততদূর উঠতে পারে না । অপর দিক থেকে মহারাজও বিরাট একটা ধবধবে সাদা তেজী ঘোড়ায় চড়ে ঠিক তার পাশটাতে এসে দাঁড়াল । নাইথবী কিছু বুঝা কিংবা বলার আগেই মহারাজা এসে নাইথকবীকে দু'হাতে জড়িয়ে.ধরে বললেন, নাইথক, আমি তোমাকে ভালবাসি ; তুমি আমার সঙ্গে চল ; আমি তোমাকে রাজরাণী করব । নাইথকবী লজ্জায় সংকোচে আড়ষ্ট হয়ে গেল । অতি কষ্টে মহারাজার হাত ছাড়িয়ে বলল, আমায় ছেড়ে দিন, আমায় ছেড়ে দিন মহারাজা । এ কথায় মহারাজা যেন কিছুটা বিব্রত হয়ে গেলেন । নাইথকবীকে ছেড়ে দিয়ে এক লাফে ঘোড়ায় চড়ে খানিকটা টগবগ করে চলে গেলেন । নাইথকবী আশা হত শূন্য দৃষ্টিতে মহারাজার যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে রইল । মহারাজা খানিকটা গেলেন বটে কিন্তু একেবারে চলে গেলেন না । কিছুদুর গিয়েই আবার দ্রুতগতিতে ফিরে এলেন । এবার কিন্তু তিনি নাইথকবীর কোন কথাই শুনলেন না । এসেই নাথকবীকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে একবারে তীরের গতিতে অজানা শূন্যের দিকে ছুটে গেলেন । স্বপ্ন দেখে নাইথকবী হুড়মুড় করে বিছানার উপর উঠে ভয়ে আনন্দে কাঁফতে লাগল । সে আজ এটা কি দেখল ! তবে কি মহারাজা তাকে জোর করে নিয়ে যাবে ! আবার নিজের মনেই বলছে, না তা হয়ত হবে না । জোর করেই যদি মহারাজা নিয়ে যেতেন তবে তো কবেই নিয়ে নিতে পারতেন । কারও বলা কওয়ার অপেক্ষা রাখতেন না । মহারাজা এবং এমনকি বড় বড় রাজার কর্মচারীরাও তাদের পছন্দসই মেয়েলোক দেখলেই জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে রাজবাড়ীতে কিংবা নিজেদের বাড়ীতে দাসী করে রাখে । মহারাজ যদি চানতো তা' স্বচ্ছন্দেই করতে পারেন । এ মহারাজা নিশ্চয়ই এমনটা করবেন না । এরকমই যদি করতেন তাহলে ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করবারই

বা কি দরকার ছিল। এত চিন্তা করেও নাইথকবীর মাথায় কিছুই ঢুকছে না। সবই গোলমেলে ঠেকছে। শুকরগুলো টংঘরের নীচে থেকে এক সময়ে ঘ্যোঁৎ ঘ্যোঁৎ করে উঠল। রাত আর বেশী বাকী নেই। বিছানা থেকে নেমে নাইথকবী দিনের কাজে লেগে গেল।

যুবরাজের সাথে ভালবাসার দিনগুলোর মধুময় স্মৃতি, তারপর ছাকলুম ওদের যুদ্ধে পাঠানো, যুদ্ধ থেকে মহারাজার ফিরে আসা এবং পুনাংতির সাথে ছোটহাজারীর বিয়ে, ওদের প্রতি মহারাজার বিরূপ মনোভাব, বিয়ের জন্য পাড়ায় পাড়ায় ঢোল পিটানোর সংবাদ এবং সবশেষে রাতের সেই স্বপ্ন সব মিলিয়ে নাইথকবীকে যেন বিবশ করে ফেলেছে। চান নেই, খাওয়া নেই, দিনরাতই যেন সে কি ভাবে আর কাঁদে। বাবা, কাকা ও মায়ের প্রবোধ সবই যেন তার কাছে অসার ঠেকছে। কাজেকর্মেও যেন আর আগের মত মন বসে না। ছাদ্রাই সেনাপতিরও মেয়ের জন্য চিন্তার শেষ নেই। সে একদিকে মেয়েকে প্রবোধ দেয় অপর দিকে মনে মনে মেয়ের ব্যথায় কাঁদে। পাঁচটি সাতটি নয়, তার এই একটি মাত্র সন্তান নাইথকবী। সব কিছুই তার কাছে প্রহেলিকার মত লাগছে। একদিকে মহারাজ বিয়ের জন্য ঢোল পিটিয়ে দিয়েছেন। অপর দিকে পুনাংতির বিয়ে থেকে আসার সময় বেশ খানিকটা পথ এসে ছোটহাজারী তাকে না জানিয়ে নাইথকবীর বিয়ে ঠিক না করতে বললেন! কি যে হবে কিছুই ভেবে পাচ্ছে না ছাদ্রাই সেনাপতি।

সেদিন সকাল বেলা, সূর্যদেব বেশ খানিকটা উপরে উঠেছে। নাইথকবী ওদের পুরাণে জুমের ঢালু দিকে যেখানটায় পাড়ার মেয়েদেরও অস্ত্র বিদ্যা শেখাত সেখানটায় হাঁটতে হাঁটতে গেল। ওর সঙ্গে আর কেউ নেই। আজকাল ও বেশীরভাগ সময় একা একাই থাকে। পাড়ায় সম বয়সীরা আজকাল ওর সংগে কথা বলতে এলেও খুব একটা কথা জমে না। কেন না, সে নিজেই যেন কেমনতর মুখ গোমরা করে বসে থাকে। তাই কথাবার্তা খুব বেশীদূর এগোয় না। এছাড়া নাইথকবীও যেন ওদের এড়িয়ে চলতে চায়। তাই আজ সে একাই এসেছে পুরাণো জুমটার এপাশে। ঘুরতে ঘুরতে একদিন যুবরাজ যেখানে দাঁড়িয়ে ওদের যুদ্ধ বিদ্যা দেখেছে সেখানে এসে দাঁড়াল। একে একে যুবরাজের সেদিনকার প্রত্যেকটি কথা তার মনে হতে লাগল। নাইথকবীর তীর ছোড়া, তলোয়ার ও বল্লম চালনা দেখে যুবরাজ যেসব প্রশংসাসূচক কথা বলছিলেন সেগুলো একে একে তার মনে হচ্ছে আর মনটা থেকে থেকে মোচড় দিয়ে উঠছে। কি জানি, কখন থেকে তার অজান্তেই দু'চোখ দিয়ে অফুরন্ত জলের ধারা গড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। এক সময়ে নাইথকবী প্রায় বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে ও জায়গাটাতে বসে পড়ল। তার বুক ফাটা আর্ত্তনাদের ভষা বন দেবীর কাছে প্রার্থনা হয়ে বেরুতে লাগল। ওগো হাইচুকমা (বনদেবী), তুমিই সুপ্রাচীন কাল থেকে আমাদের পূর্বপুরুষদের বাঁচিয়েছ; আজও আমাদেব সবকিছু দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছ। বিপদে আপদে তুমিই সব সময় আমাদের

রক্ষা করেছ । তোমার দয়াতেই অজগর সাপের স্ত্রী স্বামী পেয়েছে । এবং শেষ পর্যন্ত নিজের সম্মান রক্ষা করতে পেরেছে । আজও তুমি আমাকে বাঁচাবে -- আমার আশা পুরণ করবে । যে "ছিক্লাজুগ" সূর্যের আলোকে গংগা ফড়িং-এর পাখায় রং ধরা ও মিহি একটি রিছা তৈরী করে দিতে পারবে তাকেই মহারাজা পাটরাণী করে নেবেন । আমি কি করে ওরকম একখানা, রিছা তৈরী করতে পারি বলে দাও । তুমি বলে দাও তো দাও, না হলে আজ এক্ষুণি এই 'খুমরুংখু' গাছেই আমি ঝুলে মরব ।

ঠিক দুপুর । সূর্য্য কখন ঠিখ মাথার উপর এসে গেছে নাইথকবী বলতে পারে না । এমন সময় নীরব বনভূমি কাঁপিয়ে কে যেন বলে উঠল, আর কাঁদিস না মা নাইথক । আমি তোকে খুব স্নেহ করি । তুই মনের ব্যথায় কাঁদলে আমিও মনে খুব ব্যথা পাই । আর কাঁদিস না মা । তুই ঠিকই রাজরাণী হবি । ওদিন আমিই তোকে স্বপ্ন দেখিয়েছি । এ রাজ্যে তোর মত গুণবতী মেয়ে আর একটিও নেই । নে, তাড়াতাড়ি উঠ, ওই যে জুমের উত্তর কোণায় "ওয়ামলাং" বাঁশের ঝাড়টা দেখা যায় সেখানকার সবচেয়ে বড় এবং পাকা বাঁশটা আজই কেটে নিয়ে নে । সে বাঁশের নীচের দিক থেকে প্রথম তিনটা গাঁট বাদ দিয়ে উপরের তিনটা গাঁট পর্যন্ত কেটে একটা 'রিছাম্বি' (হাতের তাঁতে এর দ্বারা সূতা এটে দেওয়া হয়) তৈরী করে নিবি । রিছাম্বিটা খুব মসৃণ করে নিবি যাতে ওর মধ্যে তোর মুখ দেখা যায় । আর শোন, যে সূতা দিয়ে তুই রিছাটা তৈরী করবি সে সূতাগুলো কোনদিন সূর্য উঠলে কাটবি না । আর একটা কথা মনে রাখবি, রিছাটা বোনা শেষ না হতে কাউকে দেখাবি না । যদ্দিন কাজ শেষ না হবে তদ্দিন তুইও ঘর থেকে বেরুবি না । যে ঘরে কাজ করবি সে ঘরেই থাকবি । তোর মা বাবা ছাড়া কেউ যেন তোর মুখ না দেখে । এই 'রিছাম্বিটা' দিয়ে তুই যতগুলো রিছা তৈরী করতে চাস ততগুলোই করতে পারবি । তোর কাজ শেষ হলে খুলুমা ও হাইচুকমার পূজা দিতে ভুলবি না কিন্তু । তোর যখন যা জানার দরকার হবে প্রত্যেক দিন এসময় এখানে এসে আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেই বলে দেব ।

এতক্ষণ যেন নাইথকবী স্বপ্ন দেখছিল । বনদেবীর কথা শেষ হতেই নাইথকবী হকচকিয়ে উঠে দাঁড়াল । সম্বিৎ ফিরে পেয়েই সে দৌঁড়ে বাড়ীতে এসে একটা 'দা-বরক' হাতে নিয়ে জুমের উত্তর দিকে 'ওয়ামলাং বাঁশের ঝাড়টার দিকে ছুটল । ভাল করে দেখে নিয়ে সবচেয়ে বড় ও পাকা বাঁশটা কয়েকটা কোপেই কেটে নামিয়ে নিয়ে এল । তার গাঁয়ে আজ অফুরন্ত শক্তি । বনদেবীর কথামত সুন্দর করে ছেঁচে ছুলে সে একাই একটা 'রিছাম্বি' তৈরী করে ফেলল । পরদিন থেকে জুমের উৎকৃষ্ট তুলাগুলো বেছে বেছে জমা করতে দেখা গেল নাইথকবীকে । সে যেন অনেকটা ভাল হয়ে গেছে -- অনেকটা যেন স্বাভাবিক হয়ে গেছে । মেয়ের এ রকম পরিবর্তন বাপের চোখ এড়াল না । মেয়ের পরিবর্তন দেখে ছাদ্রাই সেনাপতি

খুশী হল বটে কিন্তু মন থেকে পুরোপুরি সন্দেহ গেল না । সে গোপনে নাইথকবীর চলাফেরা সবই লক্ষ্য করতে লাগল । একদিন নাইথকবীই তার বাবাকে বলল, বাবা আমাকে একটা উচু করে 'গাইরিং' (টংঘর) তৈরী করে দাও । ওঘরে বসে আমি মহারাজার ঘোষণামত একটা 'রিছা' তৈরী করব । আমার রিছা বোনা যদ্দিন শেষ না হবে তদ্দিন আমি সে ঘর থেকে বেরুব না । তুমি আর মা ছাড়া কেউ সে ঘরে যেতে পারবে না এবং তোমরা দু'জন ছাড়া কেউ আমার মুখ দেখতে পারবে না মেয়ের কথা শুনে ছাদ্রাই সেনাপতি একদিকে যেমন অবাক হল অপরদিকে খুব খুশীও হল । সেদিনই সেনাপতি লোকজন লাগিয়ে মস্ত উঁচু সুন্দর একটা টংঘর তৈরী করে ফেলল । এমনভাবে টংঘরটা তৈরী করল যাতে বাইরের লোকজন ঘরের কাউকে দেখতে না পায় । আলো বাতাস আসার জন্য বেশ খানিকটা উপরে দু'টো জানালা রাখা হল ।

এক শুভদিনে নাইথকবী চান করে পবিত্র হয়ে কিছু তুলা, চরখা ও তাঁতের অন্যান্য সাজ সরঞ্জাম নিয়ে মা বাবাকে প্রণাম করে ওই টংঘরটির উপরে গিয়ে উঠল । টংঘরে উঠার সিঁড়ির গোড়াতে সব সময়ের জন্য একজন লোক পাহারা দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে রইল ছাদ্রাই সেনাপতির আদেশে । আরম্ভ হল নাইথকবীর ঐকান্তিক সাধনা । সকাল সন্ধ্যা মা বাবা এসে তার খাবার দিয়ে যায়, খোঁজ খবর নেয় । প্রতিদিন শেষ রাত্তিরে মোরগ যখন প্রথমবারের রাত শেষ হয়ে আসার সংবাদ জানায় তখন থেকে শুরু হয় সূতা কাটা । চরকার এ্যাঁং এ্যাঁং শব্দের সাথে সাথে নাইথকবীর মনের কান্না যেন মিশে যায় । 'হাইচুকমা' -- খুলুমার আশীর্বাদে নাইথকবীর কাটা সূতা খুবই মিহি হতে লাগল -- এত মিহি হতে লাগল যে হাত দিয়েই শুধু তার অস্তিত্ব বোঝা সম্ভব । চোখ দিয়ে দেখাই যায় না । নাইথকবী সূতা কাটে আর জমিয়ে রাখে । দুটো রিছা হয় মত সূতা কাটা হয়েছে কিনা প্রতি দিনই সে সূতাগুলো হাতে নিয়ে ওজন করে দেখে । একদিন নাইথকবী সূতাগুলো হাতে নিয়ে ওজন করে অনুমানে বুঝতে পারল -- দু'টো রিছা তৈরী হতে পারে এমন সূতা সে কেটেছে। সেদিন তার মনে কি আনন্দ । সেদিনই টংঘরের বেড়ার সাথে তাঁত জুড়ে সূতাগুলো গুছিয়ে টেনে নিল । এবার সুরু হল খট্ খট্ শব্দ আর তার সাথে তাঁত বোনা । মহারাজা একটি রিছা তৈরী করবার জন্যই ঘোষণা করেছিলেন । কিন্তু একটি রিছাতে টানা উঠবে না বলে নাইথকবী একসাতে দু'টো রিছার টানাই দিয়েছে । মন্ত্রপূত 'হাইচুকমার' রিছাম্বি যখন তার হাতে রয়েছে তখন আর কি চিন্তা । যত খুশী 'রিছা' সে তৈরী করতে পারে । যেদিন দু'মাস পুরল সেদিন নাইথকবীর বাবা এসে তাকে বলল, মা নাইথক, আর কদ্দিন তুই এভাবে থাকবি ? তোর রং যে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, চোখ বসে গেছে । তুই যে দিন দিন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিস মা । তোকে দেখে আমার মন যে কিছুতেই প্রবোধ মানছে না । নাই বা হল তোর মহারাজার সংগে বিয়ে । তোকে ভাল ঘর

বর দেখে অন্য কোথাও আমি বিয়ে দেব । তুই কিচ্ছু ভাবিস না মা, তুই নেমে আয় । নাইথকবী উত্তর করল, তা হয় না বাবা । যাকে আমি জীবনে স্বামী বলে মনে মনে গ্রহণ করেছি তাকে ছাড়া অন্য কাউকে আর এ জীবনে বিয়ে করতে পারব না । বিয়ে হোক বা না হোক আমি চেষ্টা করে দেখি । আমাকে আরও কিছুদিন তোমরা সময় দাও । আর সামান্য কিছু কাজ বাকী আছে । ওটুকু হলেই আমার কাজ শেষ হয়ে যাবে । মেয়ের মনের দিকে চেয়ে ছাদ্রাই সেনাপতি আর কিছু বলল না । ব্যথা বেদনা আনন্দে সেনাপতির মনটা ভরে গেল । সে নিজের জীবনে কোন যুদ্ধে পরাজিত হয়নি । তার মেয়ে বলেই তো নাইথকবী আজ এমন কঠিন পরীক্ষায়ও অবিচল থেকে প্রাণপাত পরিশ্রম করে যাচ্ছে । সেও নিশ্চয়ই জয়ী হবে ।

আজ তিন মাস তের দিন পুরল । নাইথকবীর আনন্দ আর ধরে না । একজোড়া রিছা বোনা আজ শেষ হয়েছে । প্রথমেই সে তার বাবা মাকে বলল তার আনন্দের কথা । গাইরীং থেকে নেমেই দুপুরবেলা চলে গেল সোজা পুরানো জুমের ঢালু দিকে যেখান থেকে প্রথম 'হাইচুক্মা' দেবীর আদেশ পেয়েছিল । ঠিক আগের জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে নাইথকবী বলতে লাগল, হাইচুকমা, তোমার কৃপাতে আমি দু'টো রিছাই তৈরী করেছি । তুমি যেভাবে বলেছিলে সেভাবেই সব কাজ শেষ করেছি । এবার আমাকে কি করতে হবে বলে দাও । কিভাবে ওগুলো আমি রাজার কাছে পৌঁছে দেব বল । ওদিক থেকে 'হাইচুক্মা' দেবী বলে উঠলেন, নাইথক তোর কাজে আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি ; তুই আমার কথা মতই সব কাজ করেছিস্ । এবার 'হাইচুক্মা' ও 'খুলুমা' দেবীর পূজা দিয়ে তোর বাবাকে দিয়ে রিছা দুটো ছোট হাজারীর কাছে পাঠিয়ে দে । আমি ওকে বলে দিয়েছি, যা করবার ওই করবে । তুই রাণী হবি ।

দেবীর আদেশ পেয়ে নাইথকবী মনের আনন্দে বাড়ী ফিরে এলে । মহা ধুমধাম করে মোরগ কেটে 'হাইচুক্মা' ও 'খুলুমা' দেবীর পূজা দেওয়া হল । পরদিনই ছাদ্রাই সেনাপতি কচি 'লাইরো' পাতার রিছা দু'টোকে জড়িয়ে রাজধানীর দিকে রওয়ানা হয়ে গেল । তার সংগে ছোট ভাই ছদারায়ও গেল । বহুদিন মেয়েকে দেখেনি -- দেখেও আসবে । দু'তিন দিন হেঁটে একদিন বিকালবেলা ওরা রাজধানীতে এসে পৌঁছল । ছাদ্রাই সেনাপতি সোজা গিয়ে উঠল ছোটহাজারীর বাড়ীতে । ছোটহাজারীর সাথে দেখা করে ছাদ্রাই সেনাপতি নাইথকবীর মর্মযাতনার দিনগুলোর কথা, নিভৃত গাইরীং- এ তিনমাস তেরদিন কঠিন পরীক্ষার কথা সবই খুটিয়ে খুটিয়ে বলল । সবশেষে ছোটহাজারীর হাতে 'লাইরো' পাতায় মোড়ান 'রিছা' দুটি তার হাতে দিয়ে তার যা করবার করতে বলল । ছোটহাজারী অনেক আগেই 'হাইচুকমা' দেবীর নির্দেশ পেয়েছিল । সেদিনই সে রাত্তিরে রাজবাড়ীতে গিয়ে 'হাইচুক্মা' দেবীর নির্দেশ মত পরদিন মহারাজা যে পথে দরবারে যাবেন সে পথেরই একটি দরজায় সবার অজান্তে 'রিছা' দুটো ঝুলিয়ে দিয়ে এলে । রিছা দুটো ঝুলিয়ে দেওয়াতেও কিন্তু পরদিন কিছুই বোঝা

গেল না । দিনের আলোর সাথে রিছাগুলোর রং খুব ভলভাবে মিশে যাওয়াতেই এরকমটা হল । মনে হতে লাগল, দরজার পথটি বুঝি খোলাই আছে ।

যাই হোক সময় হলে মহারাজ দরবার ঘরে চললেন । মহারাজা আগে আগে যাচ্ছেন -- পিছনে পিছনে মহারাজার সংগে আসতে লাগল ছোট হাজারী কয়েকজন পাত্রমিত্র ও দাসদাসী যারা মহারাজাকে অন্দর মহল থেকে এগিয়ে আনতে গিয়েছিল তারা । মহারাজা যে দরজাটাতে রিছাগুলো ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল সে দরজা দিয়ে যেমনি পার হতে যাচ্ছেন অমনি তার নাকে মুখে শরীরে রিছাগুলো আটকে যাচ্ছে ! মহারাজা যতই ছাড়াতে চাইছেন ততই আটকে যাচ্ছেন ! কেন যে এরকমটা হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছে না -- অথচ চোখে তো কিছুই দেখা যায় না । সাংঘাতিক রকম রেগে গিয়ে মহারাজা ছোট হাজারীকে বললেন, দেখতো হাজারী দরজায় যাওয়ার পথে কি যেন একটা ঝুলে ছিল, নাকে মুখে জড়িয়ে যাচ্ছে মাকড়সার জালের মত । আমিতো কিছু দেখতে পাচ্ছি না । ছোট হাজারী যেন কিছুই জানে না এমনি ভান করে এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে পরখ করে দেখল । হাতে কি যেন একটা কাপড়ের মত ঠেকছে । সে বলল, মহারাজ ধর্মাবতার, মনে হচ্ছে এটা এক জোড়া 'রিছা' কেউ এখানে টাঙ্গিয়ে দিয়ে থাকবে । সাথে সাথে ছোট হাজারী রিছা দুটোকে সাবধানে গুটিয়ে নিল । মহারাজা দরবারে গেলেন । সেখানে ছোট হাজারী রিছাগুলো মহামন্ত্রীর হাতে দিল । মন্ত্রী সেগুলো ভালভাবে দেখে মহারাজাকে বলল, ধর্মাবতার, এযে দেখছি আপনি যে রকম 'রিছা' বুনে দিলে বিয়ে করবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন ঠিক সেরকমটি হয়েছে। এ রিছা যে বুনে দিয়েছে সেই হবে আমাদের মহারাণী -- রাণী মা । মহারাজ বললেন, মহামন্ত্রী তাতো হবে । কিন্তু কে যে এ রিছাগুলো বুনেছে এবং কি করেই বা ওগুলো আমার দরবারে আসার পথে এলে তাতো কিছুই বুঝতে পারি না । তোমরা সবাই সে রমনীকে খুঁজে বের কর । আমি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করব নিশ্চয়ই । সেদিন থেকে সুরু হয়ে গেল খোঁজাখুঁজির পালা । অনেক খোঁজ খবর নেওয়া হল । কিন্তু কিছুতেই কিছু বের করা গেল না । মহারাজও খুব চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন । সব কিছুই তার কাছে যেন একটা ভোজবাজীর মত লাগছে । শেষ পর্যন্ত মহারাজ আবার ঘোষণা করে দিলেন -- যে আগামী সাত দিনের মধ্যে রিছা বয়নকারিনী রমনীকে বের করে দিতে পারবে তাকে রাজ ভাণ্ডার থেকে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে । একদিন দু'দিন করে ছ'দিন চলে গেল । কিন্তু কোনদিক থেকেই কোন খবর এল না । সপ্তম দিনেও সারাটি দিন কোন খবর পাওয়া গেল না । সূর্য অস্ত যেতে আর বেশী দেরী নেই । মহারাজা অন্দর মহলে বিশ্রাম করছেন আর চিন্তা করছেন । এমন সময় ছোট হাজারী এসে মহারাজাকে প্রণাম করে বলল, মহারাজ ধর্মাবতার রিছা বয়কারিনী মেয়েটির সন্ধান পাওয়া গেছে । ধর্মাবতার যদি আদেশ করেন তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে আমি আপনার সামনে

এনে হাজির করতে পারি । এ কথা শুনে মহারাজা যেন লাফিয়ে উঠলেন । তিনি প্রায় চিৎকার দিয়ে বলে উঠলেন, সত্যি বলছ ছোট হাজারী ? যাও যাও শীগ্‌গীর গিয়ে তাকে নিয়ে এস । আমার রাজ্যে এমন গুণবতী রমনী কে আছে তাকে আমি নিজের চোখে দেখতে চাই । এরকম রিছা বোনা যে দেবতাদেরও অসাধ্য ।

যে দিন ছাদ্রাই সেনাপতি রিছাগুলো ছোট হাজারীকে দিতে এসে ছিল সেদিনই সে সেনাপতিকে আবার পাড়ায় পাঠিয়ে নাইথকবীকে আনিয়ে নিজের বাড়ীতে রেখে দিয়েছিল । সময় সুযোগ বুঝে মহারাজার সাথে দেখা করাবে বলে । তাই মহারাজ যখন আদেশ করলেন অমনি সে তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়ে নাইথকবীকে নিয়ে এল অন্দর মহলে । মহারাজার সামনে নাইথকবীকে এনে ছোট হাজারী বলল, মহারাজ ধর্মাবতার সুর্যের আলোকে গংগা ফড়িং এর পাখায় রং ধরা মিহি রিছা যে রমণী বয়ন করেছেন তিনি আপনার সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন কেবল আপনার আদেশের অপেক্ষায় । দীর্ঘদিনের কঠোর সাধনায় নাইথকবীর চেহারা যেন আরো সুন্দর হয়েছে । তার মুখ থেকে একটা দেবীতুল্য জ্যোতি যেন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল । মহারাজ অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে নাইথকবীর দিকে চেয়ে রইল । তিনি কি স্বপ্ন দেখেছেন না কোন স্বর্গের প্রতিমা তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না । আচমকা মহারাজা যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন । তিনি আসন ছেড়ে উঠে গিয়ে নাইথকবীকে জড়িয়ে ধরলেন । যুবরাজ যখন ছাদ্রাই সেনাপতির বাড়ীতে নাইথকবীকে এভাবে ধরতে যেতেন তখন নাইথকবী খুবই আপত্তি করত । আজ কিন্তু সে কিছুই বলল না । মহারাজার মুখ থেকে অনুতাপের সুর মিশে বেরিয়ে এল, নাইথক, তুমি আমাকে মার্জনা কর । তুমি সমস্ত কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে । তোমার মত গুণবতী মেয়ে এ রাজ্যে আর দ্বিতীয়টি নেই । সবদিক দিয়েই তুমি রাজরাণী হওয়ার যোগ্য । এবার আর কিছুতেই তোমাকে যেতে দিচ্ছি না । মহারাজ ছোট হাজারীর বাড়ীতেই নাইথকবীর থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন ।

রাজ্যময় আনন্দের বান ডেকে গেছে । মহারাজা বিয়ে করবেন ছাদ্রাই সেনাপতির মেয়ে নাইথকবীকে । ছাদ্রাই সেনাপতির পাড়ার সবাই এল নাইথকবীর বিয়ে উপলক্ষে রাজবাড়ীতে । দিনরাত চলতে লাগল খাওয়া দাওয়া আনন্দ উৎসব । সবার মুখেই হাসি । এক শুভক্ষণে একুশ পলা চাঁদোয়ার নীচে বাঁশের ফুলতোলা বেদীতে মহারাজার সংগে নাইথকবীর বিয়ে হল । নাইথকবী যোগ্যতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মহারাণী হলেন । রাজা ছেংথুংফা নাইথকবীকে রাণী পেয়ে মহাখুশী। নাইথকবীরও রাজরাণী হতে পেরে আনন্দের সীমা নেই । দু'এক বছর পর ওদের একটি ছেলেও হল । ছেলের নাম রাখা হল আচঙ্গ । নাইথকবীর ব্যবহারে দাসদাসীরা খুবই আনন্দিত । একনাগাড়ে দীর্ঘ দিন রাজা ছেংথুংফা রাজত্ব করলেন । রাজ্যে অভাব অভিযোগ চুরি ডাকাতি কিছুই রইল না । রাজার সুশাসনে

রাজ্যের দিকে দিকে শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল ।

দীর্ঘদিন রাজত্ব করার পর প্রাকৃতিক নিয়মেই একদিন রাজা ছেংথুংফা বুড়ো হলেন -- দেহরক্ষা করলেন । রাজ্যময় শোকের ছায়া নেমে এল । রাণী নাইথকবী স্বামীর শোকে স্বামীর সংগেই সহমরণে গেলেন । পিতার সুযোগ্য ছেলে যুবরাজ আচঙ্গ রাজ্যভার হাতে নিয়ে পিতার মতই সুন্দরভাবে রাজকার্য পরিচালনা করতে লাগলেন ।

সমাপ্ত